মিখাইল নেস্তুর্খ

মানব সমাজ

প্রজাতি, জাতি, প্রগতি

অধ্যাপক মিখাইল নেস্তুর্খ জীববিদ্যার ডক্টরেট। সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জাতিসমূহের উদ্ভব, বিকাশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গাদি এ গ্রন্থে আলোচিত ও জাতিসমূহের সমতার প্রামাণ্য তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষকে 'আদিম' ও 'প্রাগ্রসর' শ্রেণীতে বিভক্ত করার ইদানিং কালের বিভ্রান্তি-মূলক প্রয়াসসমূহও এখানে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় খণ্ডিত হয়েছে। এ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাসমূহে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় জাতিসমূহের সাম্য সম্পর্কিত প্রসঙ্গও আলোচিত।

মিখাইল নেস্তুর্খ

মানব সমাজ · প্রজাতি, জাতি, প্রগতি
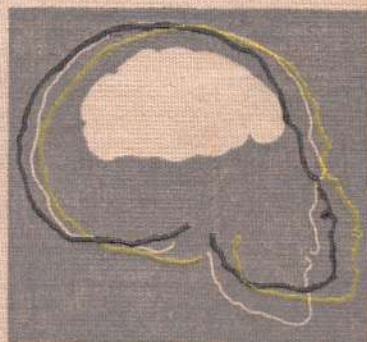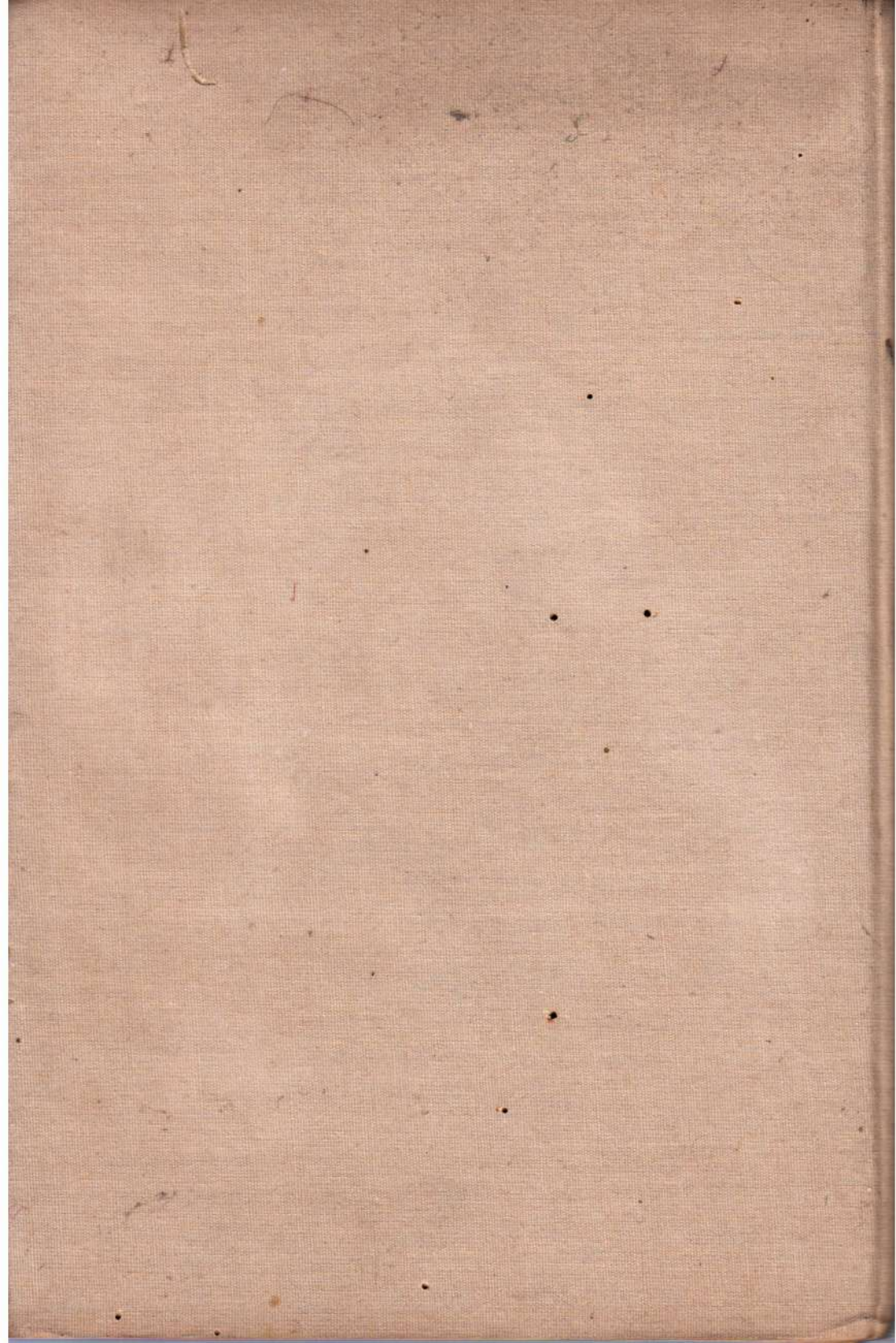
মিখাইল নেস্তুর্খ • মানব সমাজ • প্রজাতি, জাতি, প্রগতি

অধ্যাপক মিখাইল নেস্তুর্খ,

ডি. এস-সি. (জীববিদ্যা)

মানব সমাজ

প্রজাতি, জাতি, প্রগতি

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৭৬

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

•

М. Ф. Нестурх

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

চিত্র নং ২-৯, ১৩ ও ১ নং রঙীন প্লেট অধ্যাপক ভ. ভ. বুনাকের (ডি. এস-সি, জীববিদ্যা) রচনাবলী থেকে গৃহীত। অন্যান্য চিত্রগুলি ম. ভ. লমনোসভ নামাঙ্কিত লেনিন অর্ডারপ্রাপ্ত মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্ত্বিক ইনস্টিটিউট ও যাদুঘরের মহাফেজখানা থেকে গৃহীত।

$H \frac{21010-618}{014(01)-76} 654-76$

সূচি

১-২। সুদানের সিলোক উপজাতির অন্তর্গত নিগ্রো পুরুষ ও নারী (নিরক্ষীয় মহাজাতির আফ্রিকান শাখা)

৩-৪। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জবাসী পুরুষ ও নারী (নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

৫-৬। নিউজিল্যান্ডের মাওরী পুরুষ ও নারী (নিরক্ষীয় ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতিসমূহের মধ্যবর্তী সংযোগী বর্গ)

৭-৮। উদ্‌মুর্ত পুরুষ ও নারী (সোভিয়েত ইউনিয়ন) (ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতিসমূহের উত্তর শাখাগুলির সংযোগী বর্গ)

৯-১০। বাশ্‌কির পুরুষ ও নারী (সোভিয়েত ইউনিয়ন) (ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতিসমূহের উত্তর শাখাগুলির সংযোগী বর্গ)

১১-১২। নরওয়েজীয় পুরুষ ও নারী (ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা)

১
২
৩
৪
৫
৬

৭
৮
৯
১০
১১
১২
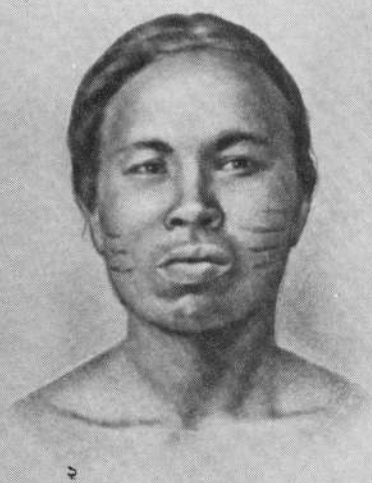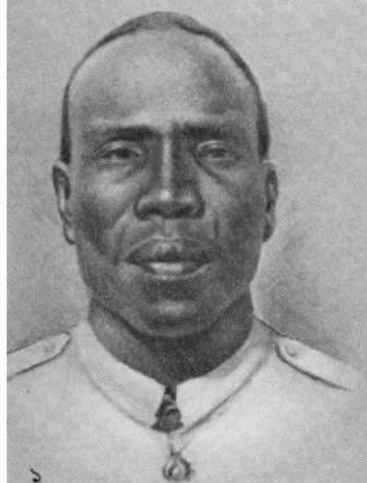
ভূমিকা

মানুষের জাতি সংক্রান্ত সমস্যাবলী নৃতত্ত্বের অন্যতম মৌলিক আলোচ্য বিষয় এবং বয়স, লিঙ্গ, ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণসঞ্জাত পরিবর্তনসহ মানুষের সমগ্র জীবতাত্ত্বিক ইতিহাসই এ বিদ্যার অন্তর্গত। বস্তুত, মানুষের জাতিসমূহ একক মানবরূপ-উদ্ভূত, ঐতিহাসিক শর্তাধীন ভৌগোলিক (বা আঞ্চলিক) প্রকার বিশেষ।

আদিম মানবের জীবনের স্বাভাবিক-ভৌগোলিক শর্তাবলী ও জাতিসমূহ উদ্ভবের যোগসূত্র, আধুনিক কালের মানুষের অতীত পূর্বপুরুষ, ইতিহাসের বিকাশে জাতিবৈষম্যের ক্রমাবলুপ্তি, জাতি-বৈষম্যবাদের ভ্রান্ত অবৈজ্ঞানিক মর্মের চূড়ান্ত অসিদ্ধতা, বিভিন্ন জাতির বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে বহু মন্তব্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের রচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন, পরনির্ভর ও পরাধীন মানুষের তুলনাবিহীন এ মুক্তি সংগ্রামের কালে মানুষের জাতিসত্তা সম্পর্কিত সঠিক প্রত্যয়ের রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য সমধিক। শ্রেণীগত, জাতিগত ও ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন অব্যাহত রাখার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাগণ জাতিসমূহের দৈহিক ও মানসিক অসাম্য, 'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীন সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত জাতি ইত্যাকার ভ্রান্ত 'তত্ত্ব' উপস্থাপিত করেছেন।

প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ ও উগ্রজাতিবাদ বা শভিনিজমের সঙ্গে জাতিবৈষম্যবাদ ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে জাতিগত কুসংস্কার ও পুরানো জাতি-বিরোধ সৃষ্ট পরিমণ্ডলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, কারণ এর ফলে সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে দীর্ঘতম, ভীষণতম, কঠিনতম ও সর্বাধিক অনমনীয় প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হতে পারে।

•

জাতিবৈষম্যবাদীদের মনুষ্যদ্বেষী আবিষ্কারসমূহ বাস্তবতা ও প্রগতিশীল বস্তুবাদী নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদির প্রত্যক্ষবিরোধী।

মানুষের জাতি সম্পর্কে সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিক ম. ফ. নেস্তুর্খ লিখিত জনপ্রিয় ও অত্যন্ত সারগর্ভ এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রকাশ তাই খুবই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে।

অধ্যাপক ম. ফ. নেস্তুর্খ লিখিত এ গ্রন্থের ভিত্তিতে আছে সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও বিজ্ঞানলব্ধ যথার্থ তথ্যাবলী এবং এইসঙ্গে বিদেশী নৃতাত্ত্বিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলীও এতে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক জাতিসমূহের উদ্ভবকে সামগ্রিকভাবে মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে পাঠকবর্গকে এ দুই সমস্যার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি প্রতিটি নৃজাতিরূপ (জাতির) ও তাদের বর্গের উদ্ভব, বিস্তারণ, মিশ্রণের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, জাতিবৈষম্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র্য উন্মোচনে সঠিক তথ্যাদি ব্যবহারক্রমে বিজ্ঞানে এর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই নেস্তুর্খ নৃতত্ত্বের মূল বিষয়েই অধিক সময় ব্যয় করেছেন কিন্তু তুলনামূলক শারীরস্থান, শারীরতত্ত্ব, প্রত্নজীববিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিবর্ণনবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, এবং ভাষাতত্ত্বও এক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত। 'অঙ্গসংস্থান ও শারীরতত্ত্ব থেকে মানুষ ও তার জাতিসমূহ সম্পর্কিত আলোচনার ইতিহাসে উত্তরণই নৃতত্ত্ব' — এঙ্গেলসের এই বিখ্যাত প্রতীতি অনুসরণেই এ গ্রন্থ লিখিত।

কেবলমাত্র জাতিবৈষম্যবাদের মুখোস উন্মোচনই নেস্তুর্খের এ গ্রন্থের লক্ষ্য এ ধারণা সঙ্গত নয়। এখানে আলোচিত সমস্যাবলীর জ্ঞানগর্ভতার তাৎপর্য প্রশস্ততর। অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্যের সঙ্গে পাঠক এ থেকে টার্সিয়ারী যুগের নরাকার এপ্‌সমূহ (মানুষ ও নব্য নরাকার এপ্‌দের দূর-পূর্বপুরুষ), আদিতম হোমিনিডসমূহ (পিথেকানথ্রপাস ও সিনানথ্রপাস), নিয়ানডার্থাল মানব এবং নব্যপর্যায়ের শিলীভূত মানব সম্পর্কে শেষতম তথ্যাদি অবহিত হবেন। আদিতম মানুষের প্রাকৃতিক নির্বাচন, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংকরণ, মহাজাতিসমূহের উৎপত্তিস্থল ও উৎপত্তিকাল, তাদের বিসরণ পন্থাদি এবং জাতির সঙ্গে উপজাতি, অধিজাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতির সম্পর্কও এখানে লেখক কর্তৃক আলোচিত।

তিনি পাঠকবর্গকে প্রাণীজগৎ পরিক্রমার শেষে নরজগতে আনয়নক্রমে মানব-ইতিহাসের প্রারম্ভকাল তাদের সামনে উন্মোচিত করেছে — যে ধারায় জীবজগতে প্রযুক্ত বিবর্তন প্রক্রিয়া সমাজবিকাশের নবগুণান্বিত নিয়মে প্রতিস্থাপিত।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অধ্যাপক নেস্তুর্খ জাতিবৈষম্যবাদের মুখোস উন্মোচন ছাড়াও 'জাতি ও ভাষা', 'জাতি ও মানসিকতা' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলীরও উল্লেখ করেছেন। মানুষের জাতিবর্গ ও ভাষাবর্গের মধ্যে নৈমিত্তিক সম্পর্কের অনুপস্থিতির পক্ষে তিনি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন; মানুষের সকল নব্যজাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতি যে একই মানসিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি তাও প্রমাণিত করেছেন। প্রসঙ্গত, বহুজাতিক সোভিয়েত দেশের কমিউনিজম এবং সমাজতান্ত্রিক জোটের অন্যান্য দেশসমূহের সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিপুল সাফল্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং মানুষ 'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' জাতিতে বিভক্ত — এমন প্রতিক্রিয়াশীল অতিকথা যে এসব দেশের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত তাও উল্লিখিত হয়েছে। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সকল জাতিই যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সৃজনকর্মে সক্ষম এ সত্যও ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে অধুনামুক্ত তরুণ রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। প্রাক্তন উপনিবেশিক ও আধা উপনিবেশিক দেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম বর্তমানে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন — 'প্রধান কথা হল, বহু দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রায়শই এখন হয়ে উঠেছে শোষণ-সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — তা যেমন সামন্ততন্ত্রের, তেমনি পুঁজিবাদী সম্পর্কেরও বিরুদ্ধে।' (১) সমস্ত রাষ্ট্রীয়জাতিই জাতিবর্গ নির্বিশেষে অগ্রসর সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সক্ষম এবং নিজ ভাগ্য স্থির করার অধিকারী।

মস্কো

অধ্যাপক **ন. ন. চেবোক্সারভ**
ডি. এস-সি (ইতিহাস),
মিক্লুখো-মাক্লাই
পুরস্কারপ্রাপ্ত

মুখবন্ধ

সাধারণভাবে নৃতত্ত্ব ও বিশেষভাবে মানুষের জাতিসমূহ ও তাদের বিকাশ সম্পর্কীয় সমস্যাবলীর মুখ্য ধারণার ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম আমরা পাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের রচনাবলীতে।

'জার্মান আদর্শবাদে' ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেন যে মানবেতিহাসের প্রথম বনিয়াদ হল মানুষের কায়িক অস্তিত্ব এবং অবশিষ্ট প্রকৃতির প্রতি তার সম্পর্কের শর্ত। (২) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বে বহু মৌলিক সমস্যার সমাধান করেন। তিনি স্বকালীন প্রকৃতিবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলির দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতা এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানে মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগ বৃদ্ধিকারী। (৩) নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলেন, 'অঙ্গসংস্থান ও শারীরতত্ত্ব থেকে মানুষ ও তার জাতিসমূহ সম্পর্কিত আলোচনার ইতিহাসে উত্তরণ' নিয়েই এই বিজ্ঞান। (৪)

জাতি সম্পর্কিত পর্যালোচনা স্বীয় বৈশিষ্ট্যেই বিজ্ঞানের একটি শাখাবিশেষ; জাতিসত্তা নির্দিষ্টকরণ ও শ্রেণীবন্ধন, তাদের বিকাশপ্রকরণ, এবং এখানে জৈবিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহের ভূমিকা নির্ণয় এর উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী বহু এবং জটিল।

জাতিসমূহ নরসমষ্টির জৈব-বিভাগ এবং বিবর্তনের দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ায় তারা আকারপ্রাপ্ত — এ প্রত্যয় থেকেই সোভিয়েত নৃতত্ত্বের যাত্রারম্ভ। জাতি সম্পর্কিত পর্যালোচনায় বিশেষজ্ঞরা প্রধানত শারীরস্থান, শারীরতত্ত্ব, ভ্রূণবিদ্যা, ও প্রত্নজীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-শাখার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু জাতিবর্ণনবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি সম্পর্কেও যথাযথ অবহিত হওয়া এক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিকের পক্ষে সম-পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ।

'জাতি' শব্দটির তাৎপর্য অনুধাবন ও অন্যান্য সামাজিক বর্গসমূহ যথা উপজাতি, অধিজাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জাতিসমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদী রচনাবলীর গুরুত্ব সমধিক।

মানুষের জাতিসমূহ সংক্রান্ত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় ও বিশ্লেষণ এবং এ জন্য মুখ্যত নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদি প্রয়োগই এ গ্রন্থের লক্ষ্য।

অধিকাংশ সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকদের মতে মানবজাতি মঙ্গোলয়েড, ইউরোপিঅয়েড ও নিগ্রোয়েড এই তিন মহাজাতিতে বিভক্ত (১৮০০ সালে জর্জ কিউভিয়ে প্রস্তাবিত পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ জাতি পরিভাষা অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে প্রায় অপ্রচলিত বিবেচিত হলেও এখনো দৈবাৎ ব্যবহৃত)। এই মহাজাতিসমূহ দৈহিক বৈশিষ্ট্যে একরূপ নয়, তারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং এসব জাতি পুনরায় বহু নৃবর্গ সমবায়ে গঠিত। এসব নৃবর্গ মধ্যবর্তী বা সংযোগকারী বর্গ দ্বারা যুক্ত; তাই নব্যমানবজাতিকে বহু নৃবর্গের মিশ্রণজাত একটি সামগ্রিক জৈবসত্তা রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব। কেন বিভিন্ন জাতির মানুষেরা একটি রাষ্ট্রীয়জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, অনুরূপভাবে কেন একটি জাতি থেকে একাধিক রাষ্ট্রীয়জাতির উদ্ভব ঘটে, এ থেকে সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব; জাতিভিত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক পৃথকীকরণ সীমারেখা সমস্থানিক নয়।

জাতি ও জাতিগত পার্থক্য চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং মানুষের মজ্জাগত কোন বৈশিষ্ট্য নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রভাবে মানব দেহে ও মনে নিরন্তর যে পরিবর্তন ঘটে সেই প্রত্যয়ানুসারী মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণা উল্লেখ্য: 'এমনকি স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত গোষ্ঠী-পার্থক্য যথা জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদি... ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মে দূরীকরণ সম্ভব।' (৫) সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথে জার আমলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জাতিগত প্রতিবন্ধসমূহের অপসারণ মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে এ পর্যায়ে উল্লেখ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আমরা মনে করি, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিবর্জিত জাতিবৈষম্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীচরিত্র উন্মোচনও এ গ্রন্থের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

কোন কোন পুঁজিবাদী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'জাতিতত্ত্ব' সম্পর্কিত বিবিধ ধারণার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক; তাদের মতে নিজের দেশের শাসকবর্গ 'প্রাগ্রসর' জাতি এবং মেহনতী মানুষ 'আদিম' জাতি রূপে অথবা শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন জাতির মানুষ 'আদিম' এবং স্বজাতীয়রা 'প্রাগ্রসর' জাতি রূপে চিহ্নিত। এভাবে শ্রেণীবন্ধনের ক্ষেত্রে মানুষের জাতিগত ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহের সঙ্গে জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে মিশ্রিত ক'রে তারা যুক্তিবর্জিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

স্পষ্টত, জাতিতত্ত্বের নামেই 'শ্বেত' সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশের মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করে, শোষণ করে — যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথাকথিত 'অশ্বেতকায়' মঙ্গোলয়েড বা নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড জাতির অন্তর্গত।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েৎনামের জনগণের বিরুদ্ধে, এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের একটি অগ্রঘাঁটি — গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েৎনামকে দমনের ও ভিয়েৎনামী জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে শ্বাসরুদ্ধ করার প্রয়াসে বহু বছর ধরে অমানুষিক যুদ্ধ চালায়। জাতিবৈষম্যবাদী আদর্শবাদের জন্য কুখ্যাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েৎনামে গণহত্যার যে রাজনীতি পরিচালনা করে তা বিশ্বসমাজে কঠোরভাবে নিন্দিত ও আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামী জনগণের অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ বিজয় এবং বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল ও শান্তিকামী শক্তিগুলির সংগ্রামী সংহতির জয়লাভের ফলেই ভিয়েৎনামে যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি পুনঃস্থাপন সম্ভব হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার প্রকৃত মানবতার আদর্শ জাতিবৈষম্যবাদী 'তত্ত্বের' সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ জাতিবৈষম্যবাদ ও যেকোন ধরনের জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সকল জনগণের সম্পূর্ণ সাম্যের জন্য আপোষহীন সংগ্রামে অবিচলিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন: 'জাতিবৈষম্যবাদ ও জাতিবিদ্বেষের অভিব্যক্তি সর্বসাধারণের বিচার্য ও বর্জনীয় বিষয়।' (৬)

সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকদের রচনায় অন্য রাষ্ট্রীয়জাতি ও জাতিসমূহের অধিকার সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত তা রুশ জনগণেরই চিরায়ত মনোভঙ্গীর প্রকাশ। দুশো বৎসরেরও বেশি পূর্বে প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ লমনোসভ সকল জাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতিসমূহের সমকক্ষতার দাবী উত্থাপন করেন। (৭)

সকল জাতির সমকক্ষতার নীতি প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মিক্‌লুখো মাক্‌লাই কর্তৃক সমর্থিত — যাঁর বিজ্ঞান গবেষণায় 'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' জাতি সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী চূড়ান্তভাবে খণ্ডিত। রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রীরাও জাতিসমূহের সমকক্ষতার জোরদার সমর্থক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলেক্সান্দর রাদিশ্চেভ ও নিকোলাই চের্নিশেভ্‌স্কি-র নাম উল্লেখ্য — যারা নৃতাত্ত্বিক সমস্যাবলী সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন এবং এ সম্পর্কিত পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অবদান বিশেষভাবে চার্লস ডারউইন ও তাঁর অনুসারীদের তত্ত্বের ভিত্তিতে সোভিয়েত নৃতত্ত্ব জাতিসমূহ এবং তাদের উদ্ভব সম্পর্কে বস্তুবাদী

প্রত্যয় উদ্ভাবনের গঠনমূলক প্রয়াসে নিরলস। এ প্রচেষ্টায় অধুনা দেশ ও বিদেশের নৃতাত্ত্বিকদের সংগৃহীত অজস্র তথ্যাবলীর সদ্ব্যবহার করা হয়।

ভ্লাদিমির লেনিনের রচনাবলীতে জাতিসমূহের সমকক্ষতার নীতি পূর্ণতথ্যগর্ভ ও সম্প্রসারিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত সরকারের জাতীয় কর্মনীতিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে এবং সোভিয়েত সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লেখক যে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তার জটিলতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। যদি পাঠকবর্গ এ গ্রন্থ পাঠে জাতি ও তাদের উদ্ভব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করেন এবং জাতিবৈষম্যবাদের অবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন তবেই লেখক কৃতার্থ বোধ করবেন।

মানুষের জাতিসমূহের সংজ্ঞার্থ

১। জাতি-চারিত্র্য এবং তাদের পর্যালোচনা

গাত্রবর্ণ, কেশ, চক্ষু, কেশ-প্রকার, অক্ষিপুট, নাসা, ওষ্ঠ, মুখাবয়ব, মুণ্ডাকৃতি, দেহ-দৈর্ঘ্য এবং অনুপাত ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠী পরস্পর থেকে বহুলাংশে পৃথক। যেকোন দেশের জনসাধারণের মধ্যেও এসব পার্থক্য সহজলক্ষ্য, কিন্তু এসব চারিত্র্যের কোন কোন সমন্বয় বংশানুক্রমিক ও নির্ভরযোগ্য স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এবং এদের অস্তিত্বের ভিত্তিতেই তারা শ্রেণীবদ্ধ ও তাদের বিশিষ্ট জাতিসত্তা নির্ণীত। এখানে অতঃপর জাতি-চারিত্র্যের কিছু কিছু উল্লেখ্য দিক আলোচিত হবে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে লিঙ্গ এবং বয়ঃক্রমগত পার্থক্যের তুলনায় জীবনে এদের গুরুত্ব অত্যল্প। (৮)

গাত্রবর্ণ, কেশ ও অক্ষিকনীনিকার বিশেষ রঙের কারণ মেলানিন নামক এক প্রকার বাদামী রঞ্জক কণিকা। দানা অথবা তরল অবস্থায় এ বস্তু দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান। চোখ ও চুলের রং বহুলাংশে গাত্রবর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

গাত্রবর্ণের গাঢ়ত্ব রঞ্জক কণিকার আয়তন ও পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েড জাতিসমূহের দেহস্থ এই রঞ্জক কণিকার আয়তন ও ঘনত্ব অন্যদের তুলনায় অত্যধিক সেজন্য এদের চর্মাভ্যন্তরীণ শিরা উপশিরা অদৃশ্য (অথবা অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট)।

একই জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন নৃবর্গের মধ্যে গাত্রবর্ণের পর্যাপ্ত পার্থক্য বর্তমান। জলবায়ু, সামাজিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যগত কারণসমূহের প্রভাব গাত্রবর্ণের উপর সমধিক। গাত্রবর্ণের গাঢ়ত্ব বর্ণনায় নিম্নলিখিত মানসমূহ ব্যবহার্য : মৃদু (light) — রক্তিম বা হলদে আভা; মধ্যম (medium) — বাদামী; গাঢ় (dark) — ঘনবাদামী অথবা প্রায় কৃষ্ণাভ।

নর-কেশ তিন প্রকার: সরল, আন্দোলিত, কুঞ্চিত। সরল কেশ দৃঢ় অথবা কোমল এবং এ অবস্থা অন্য প্রকার কেশের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত। সাবালক মানুষের মুখ ও দেহ রোমের ঘনত্ব পর্যাপ্ত থেকে শূন্য অবধি নানা পর্যায়ে বিস্তৃত।

জাতিগত চারিত্র্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্য মানুষের মুখাবয়বে সুচিহ্নিত। এর আকৃতি মুখ্যত (পূর্ণচিত্রে) গণ্ডাস্থির পরিস্ফুরণ নিয়ন্ত্রিত। বহু মঙ্গোলয়েডের মতো এ অস্থির অগ্র ও বহির্মুখীন বৃদ্ধির ফল প্রশস্ত সমতল মুখমণ্ডল (সমতল আনুভূমিক পার্শ্বচিত্র)। যেক্ষেত্রে গণ্ডাস্থিসমূহ প্রকট নয় সেক্ষেত্রে মুখাবয়ব সংকীর্ণ ও অগ্রোত্থিত (সংকীর্ণ পার্শ্বচিত্র) এবং এ মুখ বহু ইউরোপিঅয়েডে সহজলক্ষ্য।

পার্শ্ব থেকে (পার্শ্বচিত্রে) মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণের মূলে লক্ষ্য এর ঊর্ধ্বাংশ বা নাসাংশের উত্থিতির পরিমাপের উপর গুরুত্ব আরোপ অর্থাৎ মুখাভিক্ষেপের মাত্রা
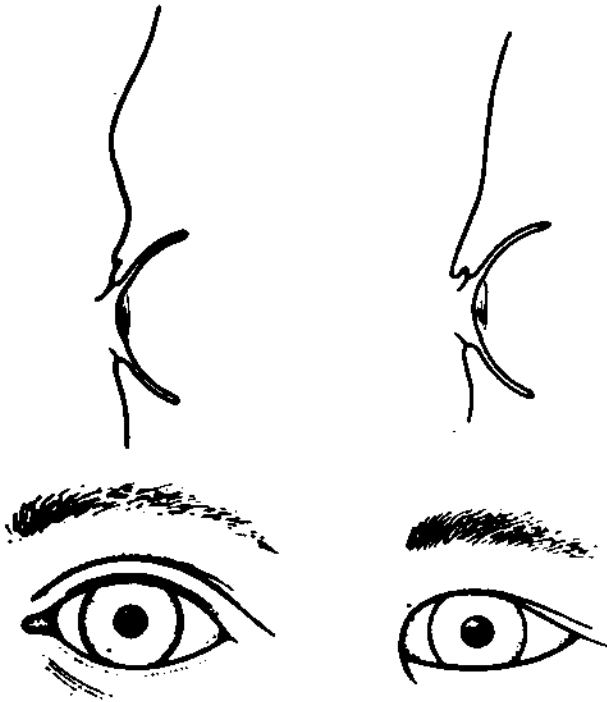
১ নং চিত্র: ইউরোপিঅয়েড (বামে) ও মঙ্গোলয়েড (ডাইনে) অক্ষিপুট ভাঁজের গঠন — প্রস্তচ্ছেদে ও সামনের দৃশ্য। বেল্জ্ অনুসারে, মার্টিন (১৯২৮) কর্তৃক রূপান্তরিত

বা উল্লম্ব পার্শ্বচিত্র নিরীক্ষণ। উদ্‌গত চোয়ালের জন্য পার্শ্বচিত্রে যে হন্বস্থি-অভিক্ষেপ লক্ষিত হয় তা প্রকট, মধ্যম অথবা মৃদু।

ঊর্ধ্ব অক্ষিপুট, কখনো নিম্ন অক্ষিপুটের ভাঁজের আকার, প্রকৃতি এবং চক্ষু উন্মীলনের পরিমিতির উপরই চোখের আকৃতি (১ নং চিত্র) নির্ভরশীল। অন্যপক্ষে উন্মীলিত চোখের আকৃতি বা অক্ষিপুটদ্বয়ের মধ্যের দূরত্ব অক্ষিপুট ত্বকের ভাঁজ-পদ্ধতি এবং এর কোষকলার স্থূলত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
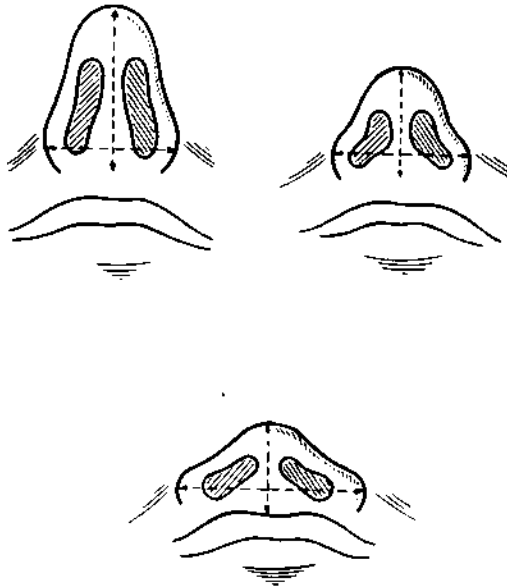
২ নং চিত্র: নাসাতলের আকৃতির প্রকার ভেদ ও নাসারন্ধ্রের লম্বাক্ষের দিক (নীচ থেকে দেখা)। তীর দ্বারা নাসাতলের প্রস্থ ও উচ্চতা চিহ্নিত

নাসাযোজকের উচ্চতা, নাসাদণ্ডের (ডর্সাম ন্যাসি) প্রকৃতি, নাসাপক্ষের (এ্যালি ন্যাসি) বিস্তৃতি এবং নাসারন্ধ্রের লম্বাক্ষের দিক দ্বারাই নাসার আকৃতি নির্ণীত (২ নং চিত্র)।
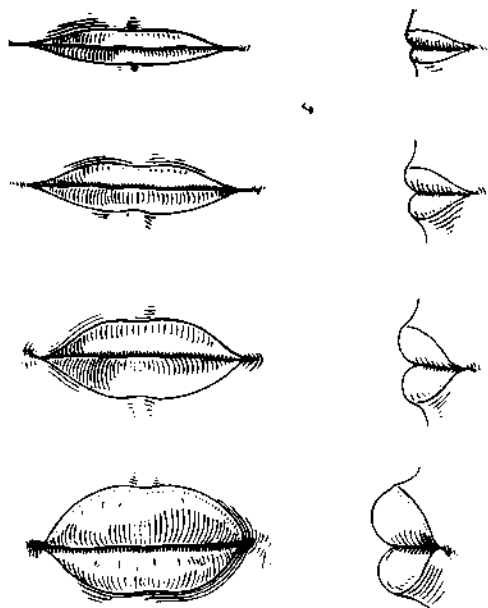
৩ নং চিত্র: ওষ্ঠের স্থূলত্বের ক্রমবৃদ্ধি (সম্মুখ ও পার্শ্বদৃশ্য) ১— পাতলা; ২— মধ্যম; ৩— পুরুষ্টু; ৪— অতি পুরুষ্টু

ওষ্ঠ চার্মত্বক, মূল ওষ্ঠ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এই তিন অংশে বিভক্ত। জাতি-চারিত্র্যের প্রশ্নে মূল ওষ্ঠের মধ্যম অংশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নৃতত্ত্বে এর প্রকৃতি চার প্রকার: পাতলা, মধ্যম, পুরুষ্টু ও অতিপুরুষ্টু (৩ নং চিত্র)।

উপরের দিক থেকে পর্যবেক্ষণে লম্বা থেকে গোলাকার এমনি বিভিন্ন ধরনের নরমুণ্ড বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। নৃতত্ত্বে ব্যবহৃত মুণ্ডাংক মস্তকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত এবং এর সূত্র $\frac{\text{প্রস্থ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}}$, অর্থাৎ যে মস্তকের দৈর্ঘ্য যত বেশি তার মুণ্ডাংকের মান তত কম।

দেহ-দৈর্ঘ্য বা ব্যক্তিক উচ্চতা একটি উল্লেখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধু বয়ঃক্রম ও লিঙ্গানুসারেই নয়, আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নৃবর্গেও এ তারতম্য সুচিহ্নিত। বিভিন্ন বর্গের পুরুষদের উচ্চতা ১৪২-১৮১ সেঃ মিঃ এবং সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে এর গড় ১৬৫ সেঃ মিঃ। যেকোন বর্গেই মানুষের দেহ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা সহজলক্ষ্য।
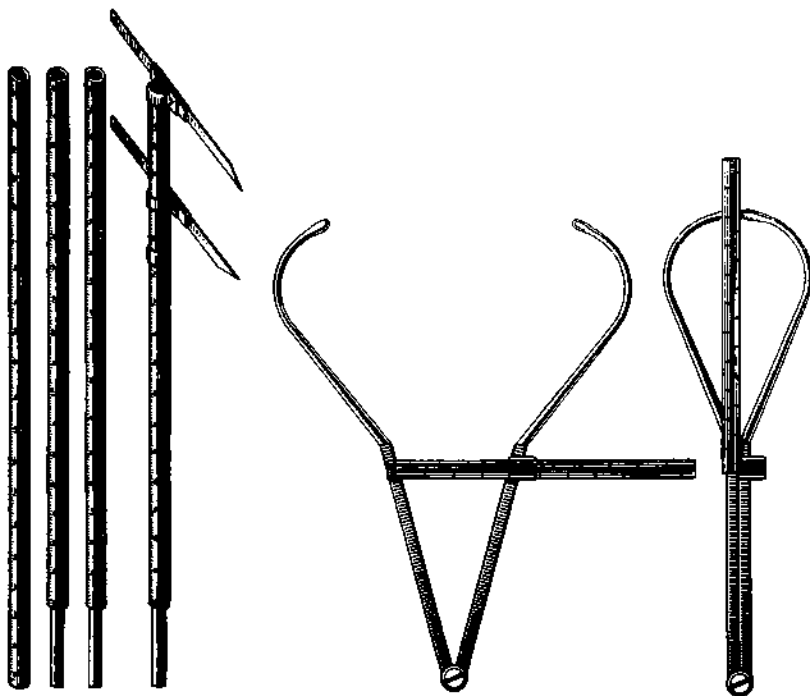
৪ নং চিত্র: দেহ ও দেহাংশের দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র — এনথ্রপোমিটার

৫ নং চিত্র: মুখ্যত মস্তক ও করোটি পরিমাপে ব্যবহৃত ক্যালিপার

জাতি-চারিত্র্য পরিমাপের জন্য বিবিধ পদ্ধতি ও বহু যন্ত্রাদি (৪-৮ নং চিত্র) ব্যবহৃত। এ ধরনের নিরীক্ষায় প্রতি ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোক নিয়ে পরীক্ষা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সর্বাধিক সমন্বয় শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, একান্ত অপরিহার্যও।
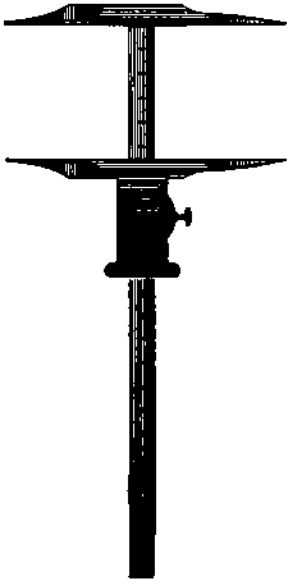
৬ নং চিত্র: দেহের ক্ষুদ্রাংশ ও প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ পরিমাপে ব্যবহার্য স্লাইডিং গেজ্
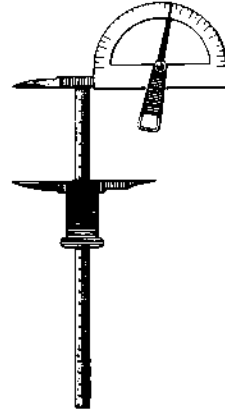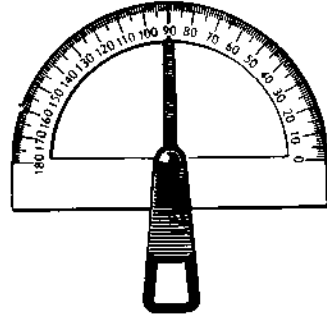
৭ নং চিত্র: মুখ-কোণ ও করোটি-কোণ পরিমাপক গনিওমিটার: ১) সাধারণ অবস্থায় ২) স্লাইডিং গেজের উপর ন্যস্ত
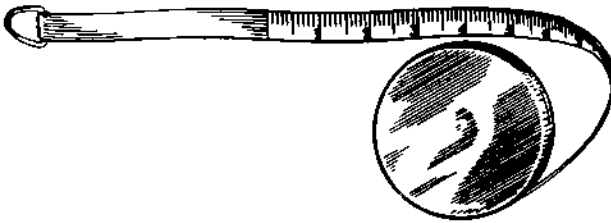
৮ নং চিত্র: বিভিন্ন দেহাংশ ও প্রত্যঙ্গ বিশেষের পরিধিমাপক মিলিমিটার চিহ্নিত ধাতব ফিতা
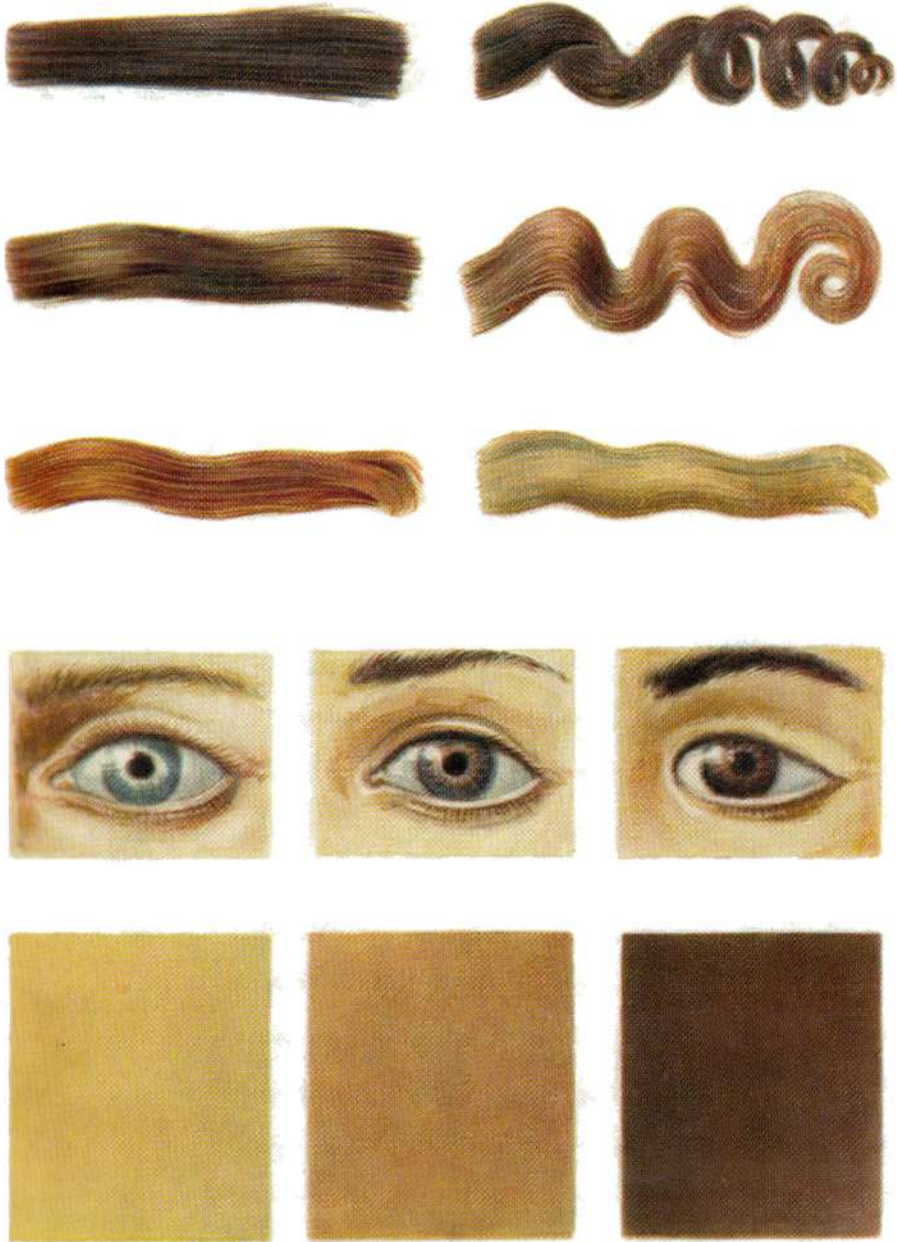
চুলের বর্ণ ও প্রকৃতি, অক্ষিকনীনিকা ও গাত্রচর্মের বর্ণ এবং চক্ষুর আকৃতির মৌলিক প্রকার ভেদ: দৃঢ় (উপরে বামে), কুঞ্চিত (উপরে ডাইনে), তরঙ্গিত কেশ, এবং বিবিধ বর্ণ; হালকা, মিশ্র ও গাঢ়বর্ণ চক্ষু (শেষেরটি অক্ষি-কোণঝুটিযুক্ত যা মঙ্গোলয়েড ও বুশম্যানদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য); হালকা, মধ্যম, ও গাঢ় গাত্রবর্ণ কণিকা

গাত্র, কেশ ও চক্ষুর (১ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) বর্ণ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ধরনের মাপনি ও বহু সংগৃহীত নমুনা ব্যবহৃত হয়। ভ. ভ. বুনাক, আ. ই. ইয়ার্খো, এবং ন. আ. সিনেলনিকভ প্রস্তাবিত পদ্ধতিসমূহই সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ঊর্ধ্ব অক্ষিপুট, বহির্নাসা, ওষ্ঠের আকৃতি আ. ই. ইয়ার্খো উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দ্বারাই এখন নির্ণীত। অভিযাত্রী দলের কাজে গাত্রবর্ণ নির্ণয়ের জন্য লুশান মাপনি (এফ. লুশান) খুবই উপযোগী। সুবহ এই মাপনিটি ৩৬টি ঈষদচ্ছ কাঁচের সংগৃহীত নমুনা সম্বলিত। কেশের বর্ণ নির্ণয়ের জন্য ফিশার মাপনি (ই. ফিশার) ব্যবহৃত হয়। অক্ষিকনীনিকার জন্য বিভিন্ন বর্ণের ১৬টি মডেলবিশিষ্ট সংগৃহীত নমুনা (আর. মার্টিন) ব্যবহৃত হয়, — সালের (কে. সালের) কর্তৃক এর উৎকর্ষ সাধিত হয়। চক্ষু, কেশ ও গাত্র বর্ণ নির্ণয়ের জন্য বুনাক (ভ. ভ. বুনাক) প্রস্তাবিত নিপুণ মাপনিটি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।
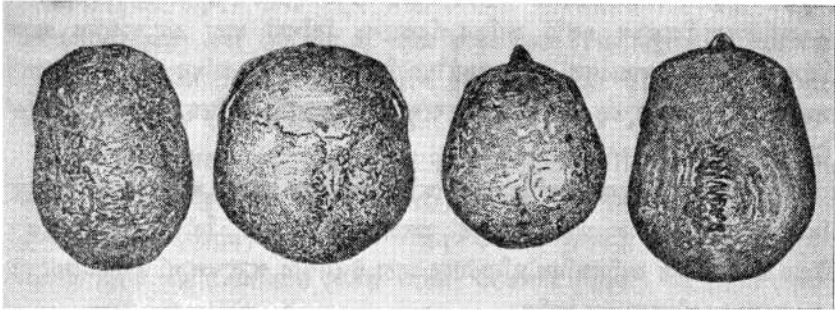
৯ নং চিত্র: বিভিন্ন আকৃতির করোটি। বাম থেকে ডাইনে: দীর্ঘমুণ্ড (উপবৃত্তাকার); দুটি হ্রস্বমুণ্ড (গোলাকার বা বৃত্তাকার); মধ্যমুণ্ড (পঞ্চকোণাকৃতি)

ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রক্রিয়া ছাড়াও নৃজাতিবিদ্যায় আরো বহুবিধ পদ্ধতি ব্যবহৃত। আলোকচিত্র, ছায়াছবি, মুখ হাত ও পায়ের ছাঁচ এবং ছবি অংকন, কেশ ও করোটির নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমেই জাতি-চারিত্র্য পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ, বিশেষভাবে করোটি ও কংকালের নৃতাত্ত্বিক-শারীরস্থানিক নিরীক্ষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয় (৯ নং চিত্র)। করোটি পর্যবেক্ষণ থেকে

বিপুল পরিমাণ সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতেই করোটিকাতত্ত্ব আজ নৃতত্ত্বের একটি বিশেষ শাখা রূপে প্রতিষ্ঠিত। (৯)

বহুসংখ্যক গণবর্গ এবং সংগৃহীত করোটি, কংকাল ও পৃথক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে প্রযুক্ত হয় যদিও এ পদ্ধতি সাধারণত অত্যন্ত জটিল। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের ফল অতঃপর ছক, গ্রাফ অথবা খোদাইক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিকেরা অল্পবিস্তর বৃহদায়তন গণবর্গসমূহের (জাতিবর্গ) আঞ্চলিক নৃজাতি রূপের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করেন। এসব জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন বসতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিয়ম-উদ্ভূত পর্যাপ্ত সুস্থিত বাহ্য চারিত্র্য (দেহের আকৃতি ও অনুপাত) এবং অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্যের এক যৌগ বিশেষ।

আধুনিক নৃতত্ত্বে জাতি-চারিত্র্য ও শ্রেণীবন্ধনের মূল্যায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি ও মান ব্যবহৃত হয়। বিবর্তনগত, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, জনসংখ্যা সংক্রান্ত ও বংশগতিজনিত হেতুসমূহ তন্মধ্যে উল্লেখ্য। হোমিনিডদের বিকাশের ফলে নৃবর্ণের উদ্ভবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (১০)

জাতিসত্তা-বিশ্লেষণ একটি জাতির বিকাশের বিশিষ্ট ধারা অনুধাবনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সাধারণত কোন রাষ্ট্রীয়জাতি এক নয়, একাধিক নৃজাতি রূপের সমাহার, এজন্য নৃতত্ত্ব-আহৃত জাতিবংশানুক্রম-তথ্যাদি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

অতীতকালীন অজস্র শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বর্জনক্রমে এখানে শুধুমাত্র জাতিসমূহ বিভক্তির অত্যাধুনিক প্রণালীসমূহই আলোচিত। আবাস, বিভিন্ন নর-গণবর্গের উদ্ভব এবং তাদের জাতিজনির ঘনিষ্টতার মাত্রা ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহই এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি।

জাতিবিশেষের স্বকীয় চারিত্র্যের যৌগ থেকে আঞ্চলিক নৃজাতিসত্তা নিরূপণ অন্যতম আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি। ('জাতিবর্গ' শব্দটির অর্থ অনির্দিষ্ট এবং তা যেকোন জনগোষ্ঠী বা জাতিরূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; আমাদের শ্রেণীবিন্যাসেও তা নির্দিষ্ট অর্থে সর্বত্র প্রযুক্ত নয়।)

বিভিন্ন আধুনিক জাতিবিদ জাতিকে জনসংখ্যার সমাহার হিসেবে বিচার করেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা, জনি-সম্পর্ক ও শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন। (১১)

নৃজাতিসত্তার বর্গসমূহ পুনরায় তিনটি 'মহাজাতিতে' একত্রিত, যথা: ১) নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড বা আফ্রো-মহাসাগরীয় বা নিরক্ষীয়, ২) ইউরোপিঅয়েড বা

ইউরেশিয়ান এবং ৩) মঙ্গোলয়েড বা এশীয় আমেরিকান। এ মূলত অধ্যাপক চেবোক্সারভ কৃত শ্রেণীবিন্যাস। (১২)

ইয়া. ইয়া. রগিন্স্কি মানুষের এই তিন মহাজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিন্নমত, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি অনুসারে এসব মহাজাতি বাইশটি জাতিতে বিভক্ত এবং এসব জাতি সাধারণভাবে অধ্যাপক চেবোক্সারভের নৃজাতিসত্তার বর্গসমূহের সদৃশ। (১৩)

ভ. ভ. বুনাক প্রস্তাবিত পদ্ধতি (১৪) পূর্বোক্ত নৃতাত্ত্বিকদ্বয় কৃত শ্রেণীবিন্যাস থেকে স্পষ্টতই পৃথক। তাঁর মতে আধুনিক ফসিল-মানুষ মধ্য অথবা নব্যপ্রস্তর যুগের শুরুতেই চারটি মূল জাতিধারায় বিভক্ত হয়েছিল।

এর প্রথমটি 'বিষুব ধারা' — এর একদিকে আফ্রিকান নিগ্রো, নেগ্রিলো-পিগমি ও বুশম্যান, এবং অন্যদিকে মেলানেশীয়, পাপুয়ান, নেগ্রিটো-পিগমি ও অবলুপ্ত টাসমানীয় জনগোষ্ঠী। এর দ্বিতীয়টি 'দক্ষিণী ধারা'। ভেদ্দা, আইনু, পলিনেশীয়, মালয়ী এবং অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা এর অন্তর্ভুক্ত। 'পশ্চিমী ধারা' এর তৃতীয় শাখা। ইথিওপীয় সহ ইউরোপিঅয়েড বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ষোলটি জাতিরূপ এর অন্তর্গত। এর চতুর্থ শাখা 'পূর্ব ধারা'। সমগ্র মঙ্গোলয়েড সহ এর অন্তর্ভুক্ত জাতিসংখ্যা ষোল এবং উরালীয় ও আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরাও এর অন্তর্গত। বুনাকের শ্রেণীবিন্যাসে মানুষের আটচল্লিশ প্রকার জাতিসত্তা স্বীকৃত এবং তদনুসারে তা বারোটি 'শাখা' বা উপজাতিতে বিন্যস্ত।

কোন কোন বিজ্ঞানী 'ব্লাড গ্রুপ' ভেদের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস প্রস্তাব করেন। যেমন, বয়েড (ডাব্লিউ. সি. বয়েড, ১৯৫০) বিভিন্ন 'ব্লাড সিস্টেমের' (এ. ভি. ও., রেসাস ফ্যাক্টর ইত্যাদি) 'ব্লাড গ্রুপে' 'জিন' বণ্টনের শতকরা মাত্রা অধ্যয়নপূর্বক মানবজাতিকে পাঁচটি জাতিতে বিভক্ত করেন: ককেশীয় ('শ্বেত'), নিগ্রোয়েড ('কৃষ্ণ'), মঙ্গোলয়েড ('পীত'), আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ও অস্ট্রালয়েড। (১৫)

এখন আমরা মানুষের মহাজাতিসমূহের নির্দিষ্ট চারিত্র্য-লক্ষণসমূহ নির্ণয়ের চেষ্টা করব এবং এ থেকেই জাতিসত্তার উদ্ভব প্রকরণ ও তাদের জৈবসত্তার সাম্য সম্পর্কে আমাদের পক্ষে যথাযথ ধারণা লাভ সম্ভব হবে।

২। নিগ্রোয়েড মহাজাতি

নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড, আফ্রো-মহাসাগরীয় অথবা নিরক্ষীয় নামেও এ জাতি চিহ্নিত এবং এই শেষোক্ত নাম ভূ-বিস্তারণ ভিত্তিক। এদের স্বকীয় চারিত্র্য-লক্ষণসমূহ (২ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) এরূপ: গাত্র, চক্ষু, কেশ গাঢ়বর্ণের; কেশ দৃঢ়-আবর্তিত অথবা

১০ নং চিত্র: নিগ্রো পুরুষ
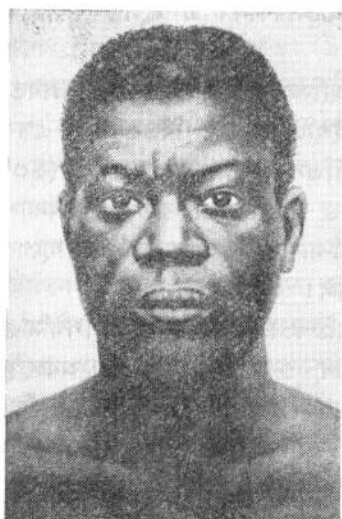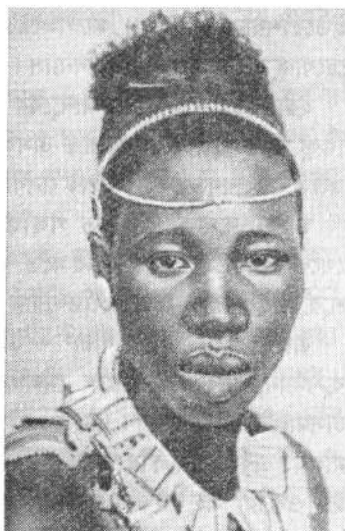
১১ নং চিত্র: নিগ্রো নারী

১২ নং চিত্র: দাহোমী-র নিগ্রো নারী
(নিরক্ষীয় মহাজাতির আফ্রিকান শাখা)

তরঙ্গিত, মুখরোম ও দেহরোম নিয়মানুযায়ী অত্যল্প যদিও বর্গবিশেষে পর্যাপ্ত দেহরোম বর্তমান; গণ্ডাস্থি সংকীর্ণ, নাসা অনুন্নত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশস্ততল, নাসারন্ধ্রের লম্বাক্ষ প্রায় পার্শ্বিক; ঊর্ধ্বচোয়াল আংশিক উত্থিত এজন্য মুখ ঈষৎ অভিক্ষিপ্ত; ওষ্ঠ পুরুষ্টু, উপরোষ্ঠ প্রলম্ব; মুখগহ্বর কিঞ্চিদধিক প্রশস্ত এবং এজাতীয় জনগোষ্ঠীর বহু মানুষের সমগ্র দেহের তুলনায় নিম্নাঙ্গ দীর্ঘতর। গাত্র, কেশ ও চোখের গাঢ় বর্ণবিন্যাসই জাতির এ নামাকরণের সূত্র (ল্যাটিন: niger—কালো)।

দূর-দূরান্তরে বিস্তারণ সত্ত্বেও এদের জনসংখ্যা মানবজাতির মাত্র এক দশমাংশ (পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৩৬০ কোটির বেশি)। নিগ্রোয়েড জাতির মূল আবাসভূমি আফ্রিকা এবং এর মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল কৃষ্ণ আফ্রিকা নামে খ্যাত। এ অঞ্চলের নিগ্রোয়েড মহাজাতির জনগণ নিজেদের 'আফ্রিকান' বলে থাকেন।

আফ্রিকানরা নিগ্রোয়েড মহাজাতির পশ্চিম শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং এ শাখার অধিকাংশই নিগ্রো (১০, ১১, ১২ নং চিত্র)। সুদানের নিগ্রোরাই এ জাতির মুখ্য প্রতিনিধি এবং এদের স্বকীয় মৌল চারিত্র্য-লক্ষণ এরূপ: গাঢ় বাদামী (চকলেট-বাদামী) গাত্র, দৃঢ়-নিবিড় কুঞ্চিত কেশ (উপরিতলের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণে কেশ চর্ম থেকে উদ্‌গত হয়, উহা অধঃত্বকে বক্রাকৃতি এবং প্রস্থচ্ছেদে ডিম্বাকার —১৩ নং চিত্র), অত্যল্প মুখরোম (গোঁফ ও দাড়ি) ও দেহরোম (কুক্ষি ও উদরনিম্ন অঞ্চলে)।

আফ্রিকান নিগ্রোদের মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি ও ঈষৎ চ্যাপ্টা। এদের কপাল উন্নত কিংবা সমতল, কখনো স্বল্প উদ্ভিন্ন অক্ষিকোঠরোর্ধ্ব শিরা বা ভ্রূ-শিরা সহ উত্থল। এদের চক্ষু বৃহদাকার ঘনবাদামীবর্ণ, নাসাযোজক নীচু, নাসাপক্ষ অত্যন্ত প্রসারিত, নাসা প্রায়ই চ্যাপ্টা, নাসাতলে এর উচ্চতা প্রস্থের মাত্র অর্ধেক এবং এ ক্ষেত্রে নাসারন্ধ্রের লম্বাক্ষ পার্শ্বমুখীন। এদের ওষ্ঠ স্থূল এবং দৃশ্যত কখনো স্ফীত মনে হয়। এদের মুখের নিম্নাংশ প্রায়ই অভিক্ষিপ্ত, চিবুক মধ্যম-উদ্ভিন্ন। এরা সাধারণত দীর্ঘমুণ্ড* (উপরের দিক থেকে)। এদের দৈহিক উচ্চতার তারতম্য ব্যাপক

---

* নরমুণ্ড দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত এবং মুণ্ডাংক $\frac{\text{প্রস্থ}\times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}}$ এ সূত্রে নির্ণীত। যে মুণ্ডাংক সর্বাধিক ৭৫·৯ তা দীর্ঘমুণ্ড, ৭৬·০—৮০·৯ অবধি মুণ্ডাংক মধ্যমুণ্ড এবং ৮১·০ কিংবা ততোধিক মুণ্ডাংক হ্রস্বমুণ্ড। নরমুণ্ডের পরিমাপে করোটিকাংকও ব্যবহৃত হয় এবং তা মুণ্ডাংক অপেক্ষা স্বল্পমানের। মধ্যকরোটিক মুণ্ডের মাপ ৭৫·০—৭৯·৯, দীর্ঘকরোটিক মুণ্ডের মাপ এর চেয়ে কম — ৭৪·৯ অবধি এবং হ্রস্বকরোটিক পরিমাপ ৮০ বা তদূর্ধ্ব।
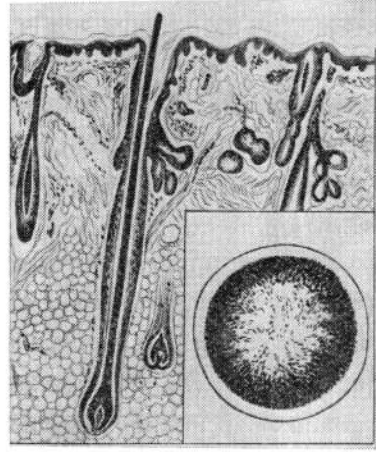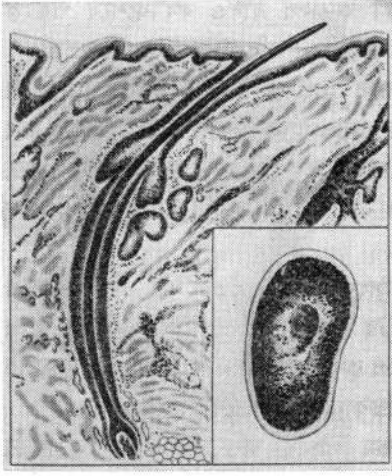
১৩ নং চিত্র: করোটির বহিরাবরণের প্রস্থচ্ছেদ। বামে: কুঞ্চিত কেশ সহ;
ডাইনে: সরল কেশ। অভ্যন্তরে স্থাপিত: ঐ কেশের প্রস্থচ্ছেদ

কিন্তু নিগ্রোয়েড জাতির বহুসংখ্যক লোকই দীর্ঘদেহী এবং নিম্নাঙ্গ দেহের তুলনায় দীর্ঘতর।

নিগ্রোয়েড জাতির মধ্যে বহু নৃজাতি রূপ বর্তমান এবং সুচিহ্নিত দেহ-বৈশিষ্ট্যে তারা সুদানী নিগ্রো অপেক্ষা পৃথক। এদের কারো গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত হালকা, অন্যদের নাসা সরু সরল, তৃতীয় দলের ওষ্ঠ স্বল্পস্থূল, চতুর্থ দল খর্বদেহী এবং দেহের তুলনায় পদ মধ্যম দীর্ঘ*। নীল অঞ্চলীয় নিগ্রোদের উচ্চতার ১৮০ সেঃ মিঃ এবং এরা পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষের অন্যতম।

---

* একই দৈর্ঘ্যের মানুষের দেহানুপাতের বিভিন্নতা ব্যাপক। এ মান দেহ (মধ্যশরীর, গলা ও মস্তক) ও পদের অনুপাতে নির্ণীত। খর্বদেহ দীর্ঘপদ ব্যক্তি দীর্ঘাঙ্গী, খর্বদেহ মধ্যমপদ ব্যক্তি মধ্যমাঙ্গী এবং দীর্ঘদেহী খর্বপদ ব্যক্তি হ্রস্বাঙ্গী রূপে চিহ্নিত। দীর্ঘাঙ্গিতা ও হ্রস্বাঙ্গিতা কোন কোন নৃজাতিরূপের বিশিষ্ট চারিত্র্য-লক্ষণ এবং তিন মহাজাতির প্রত্যেকটির মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। নিগ্রোয়েড মহাজাতির কোন কোন বর্গে দীর্ঘাঙ্গিতার প্রাধান্য প্রকট (নিগ্রো, ইথিওপীয়, অস্ট্রেলীয়), অন্যেরা মধ্যমাঙ্গী (পাপুয়ান) এবং তৃতীয় দল হ্রস্বাঙ্গী (মেলানেশীয়, পিগমি)। দীর্ঘাঙ্গিতা সাধারণত দীর্ঘদেহের সঙ্গেই অন্বিত, অন্যপক্ষে অধিকাংশ লোকেই মধ্যমাঙ্গী।

নিগ্রোয়েড (বামে), ইউরোপিঅয়েড (মধ্যে), মঙ্গোলয়েড (ডাইনে)

২ নং প্লেট
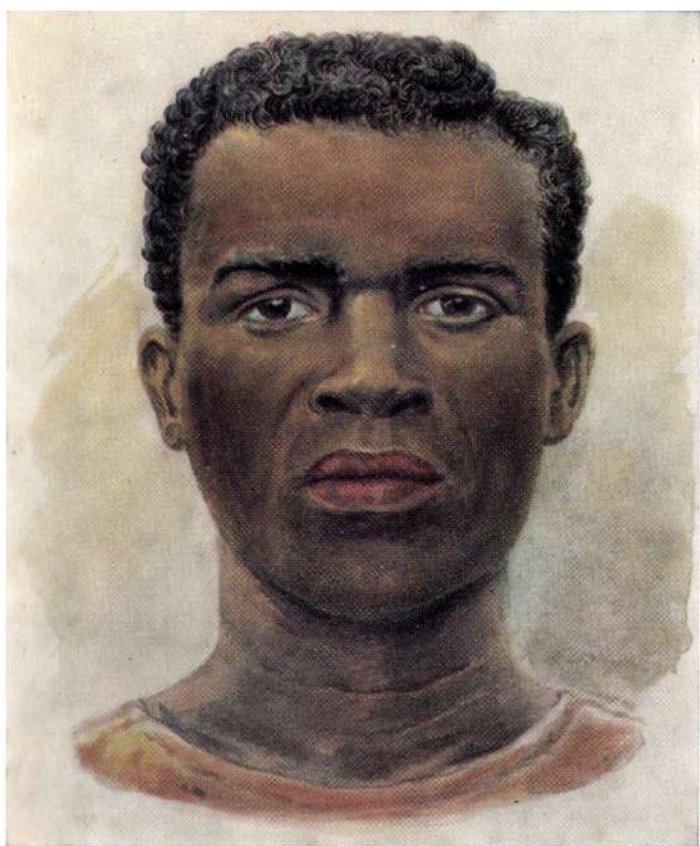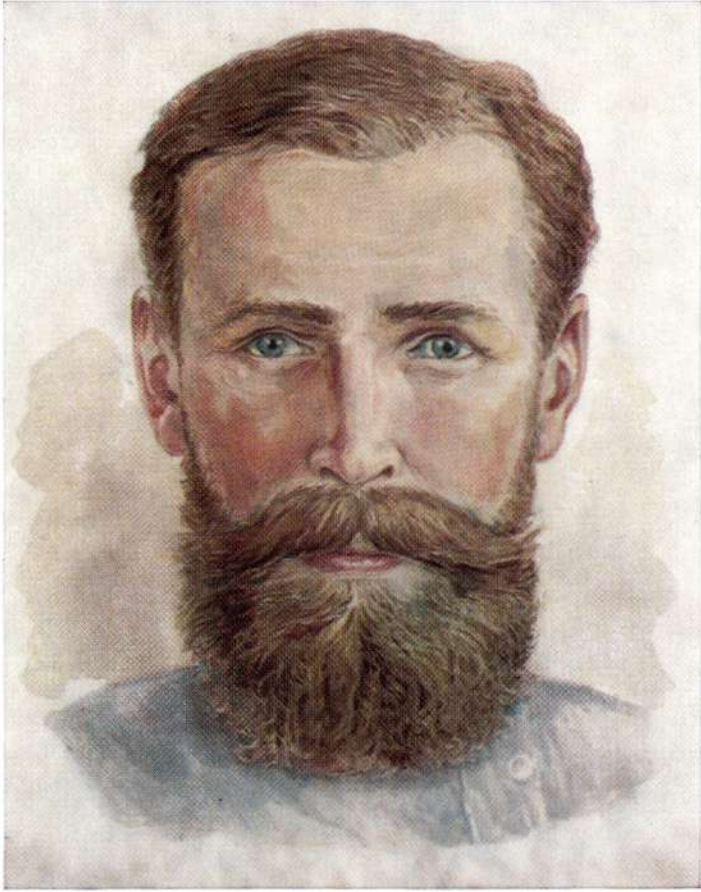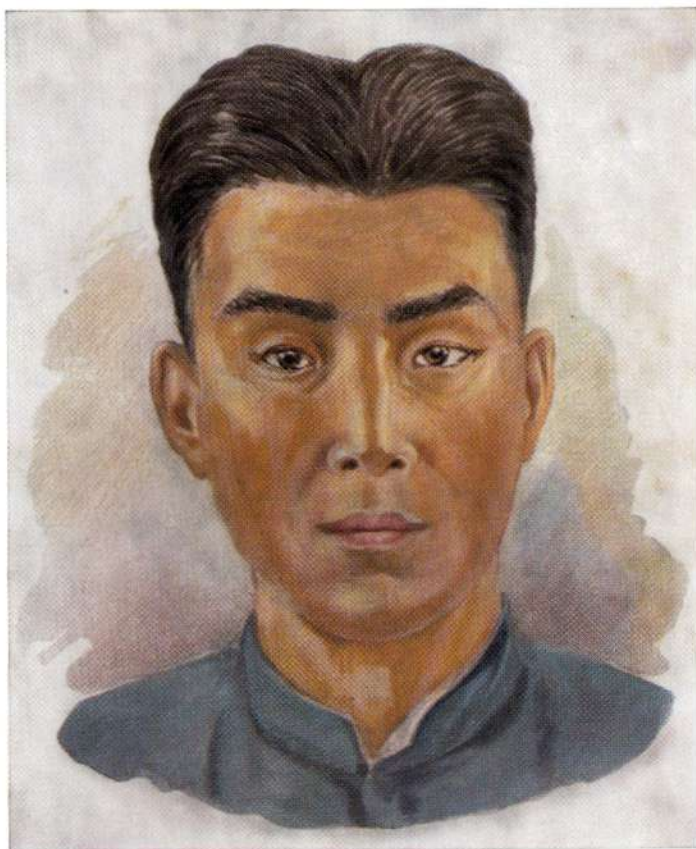
সুদানী নৃবর্গ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা (বুশম্যান), মধ্য আফ্রিকা (পিগমি) এবং পূর্ব আফ্রিকার (ইথিওপীয়) বর্গসমূহও মূল নিগ্রোয়েড জাতির অন্তর্ভুক্ত।

নিগ্রোয়েড মহাজাতির পূর্বশাখা অস্ট্রালয়েড বা মহাসাগরীয় জাতি দ্বারা গঠিত। এ প্রসঙ্গে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রালয়েডদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। আফ্রিকান নিগ্রোদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যের জন্য এদের পৃথকীকরণের প্রশ্নে নৃতাত্ত্বিকেরাও
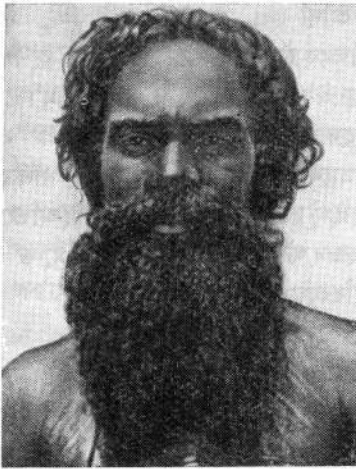
১৪ নং চিত্র: অরুন্তা উপজাতির অস্ট্রেলীয় পুরুষ
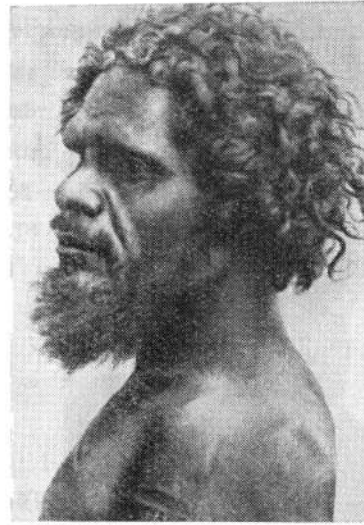
১৫ নং চিত্র: ভর্কিত উপজাতির অস্ট্রেলীয় পুরুষ

(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। নিগ্রোদের সঙ্গে পর্যাপ্ত সাদৃশ্য সত্ত্বেও অন্যান্য অস্ট্রালয়েডদের স্বাতন্ত্র্য সুচিহ্নিত। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (১৪, ১৫ নং চিত্র)। নিরক্ষীয় পূর্বশাখাকে কখনো কখনো যেহেতু অস্ট্রালয়েড নামে অভিহিত করা হয়, সেজন্য এদের বর্ণনা থেকেই এখন আমরা এ প্রসঙ্গ শুরু করছি।

অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের সংখ্যা ১৯৬৬ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪০,০০০।

অস্ট্রেলীয় জাতির মধ্যে স্থানিক কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও এ জনগোষ্ঠী সাধারণভাবে যথেষ্ট সদৃশ এবং জাতিরূপের আদর্শস্বরূপ। অপেক্ষাকৃত সীমিত আয়তন মহাদেশে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাদের বিকাশই এই সাদৃশ্যের কারণ। নৃতাত্ত্বিকেরা কয়েক দশক ধরে অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণা করছেন কিন্তু অদ্যাবধি এদের সকল বর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয় নি।

অধিকাংশ অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মুখ্য চারিত্র্য-লক্ষণ: গাঢ় অথবা চকলেট-বাদামী গাত্রবর্ণ, তরঙ্গিত কালো কেশ, পর্যাপ্ত দেহরোম ও মুখরোম (দাড়ি, গোঁফ); সংকীর্ণ ও খাটো মুখমণ্ডল, উন্নত অক্ষিকোটরোর্ধ্ব-শিরা (ভ্রূ-শিরা) সহ ঈষৎ ঢালু কপাল, ঘন-বাদামী চোখ, বৃহদায়তন নাসা, নীচু অথবা মধ্যম নাসাযোজক*, অতি প্রশস্ত নাসারন্ধ্র, পুরুষ্টু ওষ্ঠ, উদ্‌গত চোয়াল (অভিক্ষেপ সহজদৃষ্ট), সরু চিবুক, দীর্ঘ মুণ্ড এবং অধিকাংশের দীর্ঘ-দেহ।

১৬ নং চিত্র: টাসমানীয় পুরুষ (নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা একটি বিচ্ছিন্ন জাতিবর্গ নয়। নিউগিনি ও অন্যান্য প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মেলানেশীয় এবং পাপুয়ান নৃবর্গসমূহ অস্ট্রেলীয়দের আত্মীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবলুপ্ত টাসমানীয়রাও মেলানেশীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১৬ নং চিত্র)।

কোন কোন প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিত অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের জাতিরূপের

* যে নাসামূল ঢালু তার যোজক নীচু। যার নাসাস্থি প্রকট তার নাসাযোজক উঁচু; পার্শ্বচিত্রে এক্ষেত্রে কপাল ও নাসা প্রায় একই রেখায় অবস্থিত এবং যোজক ঈষৎ খাঁদালো। নাসারেখা অস্থি ও কোমলাস্থি কিংবা যে কোনটিতে অবতল, সরল অথবা উত্তল হতে পারে।

মূল্যায়নে এদের অতি নিম্নস্তরে, প্রায় নিয়ানডার্থাল পর্যায়ে অবনমিত করেছেন। এ ধারণা হাস্যকর কারণ অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা অন্য সব জাতির প্রতিনিধিদের মতোই সমমানের নব্যমানুষ। ঢালু কপাল, অত্যুচ্চ ভ্রূ-শিরা, অনুন্নত চিবুক এদের এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য অন্য নরবর্গেও দুষ্প্রাপ্য নয়।

ইউরোপিঅয়েড সহ অন্যান্য জাতির মানুষের সঙ্গে অস্ট্রেলীয়দের আন্তর্বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সন্তান লাভ করে। টাসমানীয়-অস্ট্রেলীয়-ইউরোপিঅয়েড এই ত্রিধারা উদ্ভূত কয়েক শত সংকর আজ অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। অস্ট্রেলিয়ায় মিশ্রজাতির জনসংখ্যা সর্বমোট ৪০,০০০।
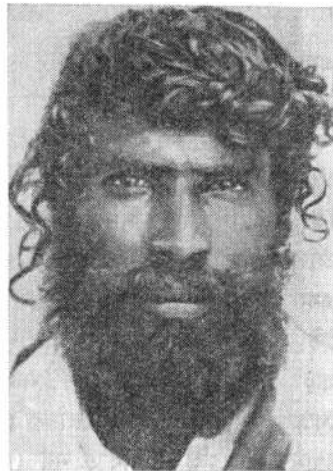
১৭ নং চিত্র: দক্ষিণ ভারতের টোডা পুরুষ
(ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির দক্ষিণী শাখা)

৩। ইউরোপিঅয়েড মহাজাতি

ইউরোপিঅয়েড বা ইউরেশিয়ান মহাজাতি (২ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) জন-সংখ্যাবহুল এবং মানবজাতির প্রায় ৫৩ ভাগ লোক এদের অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকা ও পরে অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর ইউরোপিঅয়েডরা এখন সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। এ জাতির কেন্দ্রভূমি অবশ্য প্রাচীন বিশ্বে — ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত। একমাত্র ভারতবর্ষেই ৫৫ কোটির বেশি ভারতীয় বসবাস করেন (১৭ নং চিত্র)*, যাদের বেশির ভাগই ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত।

---

* ভারতীয় জনবর্গের জাতি ও অন্যান্য বিষয়ক অধ্যয়নের মধ্যে প্রগতিশীল ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদদের কাজই উল্লেখ্য। (১৬)

সোভিয়েত নৃতত্ত্ববিদরা নিজেদের দিক থেকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজের জন্য ১৯৬৪, ১৯৬৬ ও ১৯৭১ সালে ভারতে অভিযাত্রী দল পাঠান। এগুলি আয়োজিত হয় অধ্যাপক ন. ন.

ইউরোপিঅয়েড জাতির স্বকীয় চারিত্র্য-লক্ষণ: গাত্র হালকা থেকে গাঢ় বর্ণের এমনকি বাদামী, মুখমণ্ডল রক্তিম অথবা মৃদুরক্তিম আভাকীর্ণ; কেশ কোমল, তরঙ্গিত (কখনো সরল), হালকা থেকে নানা পর্যায়ের গাঢ়বর্ণের*; দেহরোম পর্যাপ্ত অথবা মধ্যমঘন; মুখমণ্ডল সুগঠিত, কপাল সমতল বা ঈষৎ ঢালু।

মুখের মধ্যভাগ (নাসামূল থেকে ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবিন্দু অবধি) তীক্ষ্ণভাবে উত্থিত কিন্তু গণ্ডাস্থি ও চোয়াল অপ্রকট; মুখমণ্ডল সাধারণভাবে অনুদ্গত (অর্থাৎ প্রকট অভিক্ষেপহীন অথবা অভিক্ষিপ্ত অংশবিহীন); চক্ষুকোণদ্বয় একই সমতলে অবস্থিত এবং অক্ষিপুটের ভাঁজ স্বল্প উদ্ভিন্ন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চক্ষু বাদামী বর্ণ, কিন্তু ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় বহু লোকের চোখ ধূসর অথবা হালকা থেকে গাঢ় নীল**; নাসা সংকীর্ণ, নাসাযোজক যথেষ্ট উঁচু, নাসারন্ধ্রের লম্বাক্ষ সামনে থেকে পেছনে প্রায় সরল রৈখিক (একে নাসার তীরাবস্থান বলে), ঠোঁট পাতলা অথবা মধ্যমস্থূল কিন্তু প্রবর্ধিত নয় (অপ্রলম্ব ওষ্ঠ); চিবুক মধ্যম অথবা প্রকটভাবে উদ্ভিন্ন; মুণ্ডের আকৃতি বিবিধ এবং তিন প্রকার মুণ্ডই বহুব্যাপ্ত।

ইউরোপিঅয়েড মহাজাতি দক্ষিণী বা ইন্দো-ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপিঅয়েড (১৮,১৯ নং চিত্র) এবং উত্তর বা আটলাণ্টো-বল্টিক ইউরোপিঅয়েড (২০ নং চিত্র) এই দুই জাতিতে বিভক্ত। এ ধারার প্রথম জাতির গাত্র, কেশ ও চক্ষু গাঢ়বর্ণের এবং দ্বিতীয় জাতির ক্ষেত্রে এ বর্ণবিন্যাস অনেকাংশে মৃদু। এই দুই জাতি বহু অন্তর্বর্তী

চেবোক্সারভের পরিচালনাধীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির নৃজাতিবিদ্যা ইনস্টিটিউট কর্তৃক। এই দলগুলির সাথে একত্রে কাজ করেন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা কেন্দ্র ও পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের কর্মীরা এবং মানব জাতি সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞরা (১৯৭১ সালের অভিযাত্রী দলটির নেতৃত্ব করেণ অধ্যাপক ম. গ. আবদুশেলিশ্ভিলি)।

* চুলের রং মেলানিনের দানা ও তরল অবস্থার পরিমাণগত অনুপাতের উপর নির্ভরশীল। লালচে চুলেই এ রঞ্জক কণিকা সর্বাধিক পরিমাণে গলিত অবস্থায় বর্তমান। গাঢ়বর্ণ চুলে দানাদার মেলানিনই সর্বাধিক। সাধারণভাবে দানাদার মেলানিনের পরিমাণের উপরই চুলের রঙের গাঢ়ত্ব নির্ভরশীল। গাঢ়বর্ণ চুল কালো অথবা ঘন-বাদামী; মধ্যমবর্ণ চুল নানা পর্যায়ের পিঙ্গলবর্ণ (চেস্টনাট রং) এবং হালকা রং চুল স্বর্ণাভ; কখনো বা ধবল লোক দেখা যায় তাদের চুল সাদা এবং রঞ্জকবিহীন; ব্যক্তি বিশেষের চর্ম ও চক্ষু বর্ণহীন।

** চক্ষু, তদপেক্ষা অক্ষিকনীনিকার রং কেবলমাত্র মেলানিন কণা নয়, এর পরিন্যাস পদ্ধতির উপরও নির্ভরশীল। অক্ষিকনীনিকার গভীরে ন্যস্ত বর্ণকণিকার ফল চোখের হালকা অথবা গাঢ় নীল বর্ণ; এ ক্ষেত্রে অবশ্য রক্ত সঞ্চালক স্তর মেলানিনশূন্য থাকে এবং পরিন্যস্ত বর্ণকণিকা কিছুদূরে নীচ অবধি দেখা যায়। অক্ষিকনীনিকার বর্ণ অনুসারে চক্ষু গাঢ়, মিশ্র ও হালকা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।
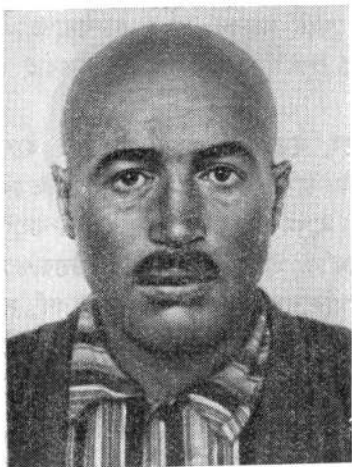
১৮ নং চিত্র: তাজিক পুরুষ
(ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির দক্ষিণী শাখা)

২০ নং চিত্র: নরওয়েজীর পুরুষ
(ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা
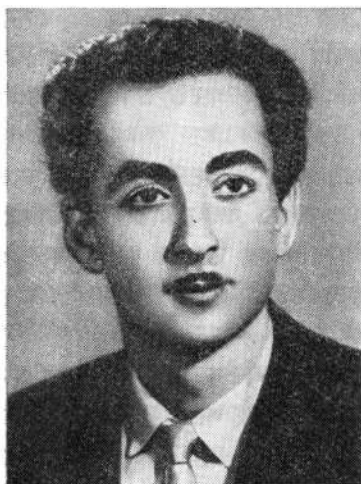
১৯ নং চিত্র: আর্মানী পুরুষ ও নারী
(ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির দক্ষিণী শাখা)

বা সংযোগকারী নৃবর্গ দ্বারা যুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে গাঢ়বর্ণ কেশ, হ্রস্বমুণ্ড এবং মধ্যম উচ্চতাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। রগিনস্কির শ্রেণীবিন্যাসে (১৯৫৬) এরাই মধ্য ইউরোপীয় জাতি রূপে চিহ্নিত।

ভারতীয়, তাজিক, আর্মানী, গ্রীক, আরব, ইতালীয়, স্পেনিয়ার্ডরাই ইন্দো-ভূমধ্যসাগরীয় জাতির প্রতিনিধি। এদের স্বকীয় চারিত্র্য-লক্ষণ: কালো তরঙ্গিত কেশ, বাদামী চক্ষু, উত্তল নাসারেখা, অতিসংকীর্ণ মুখমণ্ডল, দীর্ঘ থেকে হ্রস্বমুণ্ড।

রুশ, বেলোরুশ, পোল, নরওয়েজীয়, জার্মান, ইংরেজ এবং দূর উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য ইউরোপীয়রা নানা চারিত্র্যের এক যৌগবিশেষ। অতি হালকা দেহবর্ণ, সাদা থেকে মৃদু বাদামী কেশ, ধূসর অথবা নীল চক্ষু এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘনাসা এদের প্রকট চারিত্র্য-লক্ষণ। উত্তর ইউরোপীয়দের অধিকাংশই দীর্ঘদেহী এবং এদের দ্বারা আটলান্টো-বল্টিক জাতি গঠিত।

৪। মঙ্গোলয়েড মহাজাতি

মানব জাতির ৩৭ শতাংশ লোক মঙ্গোলয়েড বা এশীয়-আমেরিকান মহাজাতির (২ নং প্লেট) অন্তর্ভুক্ত এবং এদের প্রায় অর্ধাংশ, ৭০ কোটি লোকই চৈনিক। মঙ্গোলয়েড মহাজাতির অধিকাংশ লোকই এশীয় এবং এই মহাদেশের উত্তর, মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলই এদের মূল আবাস। মঙ্গোলয়েড জাতি মহাসাগরীয় অঞ্চল ও আমেরিকা মহাদেশেও বিস্তৃত।

ইয়াকুত, বুরিয়াত, তুঙ্গুস (ইভেংক্), চুকচা, তুভী, আলতাই, গিলিয়াক (নিভ্), আলেউত, এশীয় এস্কিমো এবং অন্য বহু মঙ্গোলয়েড বর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় অঞ্চলে সহজদৃষ্ট। কালমিক, নোগাই, বাশকির, তাতার, চুভাশ এবং অন্য কয়েকটি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড জাতির সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশের ফলেই উদ্ভূত।

মঙ্গোলয়েড মহাজাতির স্বকীয় চারিত্র্য-লক্ষণসমূহ নিম্ন-রূপ: হলুদ বা হলদে আভাকীর্ণ হালকা থেকে গাঢ় গাত্রবর্ণ; কেশ প্রায় সর্বত্রই সরল, দৃঢ় এবং সাধারণত কালো; দাড়ি ও গোঁফের বিলম্বিত উদ্ভবই এ ক্ষেত্রে নিয়ম এবং তার পরিমাণও অত্যল্প; গাত্র-রোম প্রায় অনুপস্থিত।

এ জাতির বহু নৃবর্গের বিশেষভাবে উত্তরাঞ্চলীয় মঙ্গোলয়েডদের সুচিহ্নিত দেহবৈশিষ্ট্য এরূপ: প্রশস্ত, মধ্যম অভিক্ষিপ্ত (মধ্যমোদ্‌গম্য) মুখমণ্ডল; প্রশস্ত

২১ নং চিত্র: মঙ্গোলীয় নারী
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা)

উত্থিত গন্ডাস্থির জন্য মুখমন্ডল চ্যাপ্টা; চক্ষু বাদামী, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখের ফাঁক মধ্যম-প্রশস্ত কিন্তু চিকনচেরা চক্ষুও সহজদৃষ্ট; কখনো চোখের বহিঃকোণ অন্তঃকোণ অপেক্ষা ঊর্ধ্বস্থ; ঊর্ধ্ব অক্ষিপুটের ভাঁজ প্রকট, কখনো তা অক্ষিপালক অবধি প্রসারিত এবং নিম্ন অক্ষিপুট অতিক্রমক্রমে অংশত অথবা সম্পূর্ণভাবে অশ্রুগহবর সহ অক্ষি অন্তঃকোণ আবৃত করে, ফলত অক্ষিকোণঝুটি উদ্ভূত হয়; নাসা মধ্যম-প্রশস্ত, ঈষৎ উদ্‌গত, সাধারণত নীচু যোজক যুক্ত (আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের নাসা অত্যুদ্যত, যোজক উচ্চ কিন্তু এস্কিমোদের নাসাযোজক অত্যন্ত নীচু), নাসারন্ধ্রের অবস্থান প্রধানত মধ্যস্থানিক এবং তা লম্বাক্ষের সঙ্গে প্রায় ৯০ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত; ওষ্ঠ পাতলা অথবা মধ্যমস্থূল, উপরোষ্ঠ প্রলম্ব, চিবুকচূড়া মধ্যমোদ্ভিন্ন, এবং এরা ব্যাপক সংখ্যায় মধ্যম-মুন্ড।

মঙ্গোলয়েড মহাজাতি তিন জাতিতে বিভক্ত। এর প্রথমটি উত্তর বা এশীয় মহাদেশীয় মঙ্গোলয়েড, দ্বিতীয়টি দক্ষিণ বা এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় মঙ্গোলয়েড, এবং তৃতীয়টি আমেরিকার মঙ্গোলয়েড।

উত্তর বা এশীয় মহাদেশীয় মঙ্গোলয়েডদের প্রতিনিধিস্বরূপ বুরিয়াত ও মঙ্গোলীয়দের (২১ নং চিত্র) নাম উল্লেখ্য। মঙ্গোলয়েড চারিত্র্য এ ক্ষেত্রে সুচিহ্নিত না হলেও এরা স্পষ্টতই মঙ্গোলয়েড অন্তর্ভুক্ত। এদের গাত্রবর্ণ, কেশ, চক্ষু হালকা

২২ নং চিত্র: দক্ষিণ আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান — প্যাটাগোনীয় মানব
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির আমেরিকান শাখা)

রঙের, কেশ সর্বত্র দৃঢ় নয় কিন্তু দাড়ি অত্যল্প, ঠোঁট পাতলা, মুখ-মণ্ডল প্রশস্ত ও সমতল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দক্ষিণী মঙ্গোলয়েড জাতিরই প্রাধান্য। মালয়ী, জাভানী, সুন্দা প্রভৃতি এর প্রতিনিধিস্থানীয় জাতি এবং এদের অধিকাংশেরই গাত্রবর্ণ গাঢ়, মুখমণ্ডল অগভীর ও সংকীর্ণ, ওষ্ঠ পুরুষ্টু বা মধ্যম স্থূল এবং নাসা প্রশস্ত; উত্তরাঞ্চলীয়দের তুলনায় এদের মধ্যে অক্ষিকোণঝুটি প্রায় দুষ্প্রাপ্য; এদের

দাড়ি বর্তমান কিন্তু পর্যাপ্ত নয় এবং কেশ কখনো তরঙ্গিত; উত্তর মঙ্গোলয়েডদের চেয়ে এদের দৈহিক উচ্চতা কম এবং চীনাদের অপেক্ষা এরা খর্বতর।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা মঙ্গোলয়েড ধারার তৃতীয় জাতি। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এদের অবস্থান মধ্যবর্তী। এদের মঙ্গোলয়েড বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য রূপে প্রকট নয় এবং কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যের জন্য এরা বহুলাংশে ইউরোপিঅয়েডদের সমীপবর্তী। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের (২২ নং চিত্র) কেশ সরল, দৃঢ়, কালো; দাড়ি, গোঁফ, গাত্ররোম অত্যল্প; গাত্রবর্ণ হলদে-বাদামী, চক্ষু গাঢ় ও বাদামী বর্ণের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখমণ্ডল প্রশস্ত। এসব চারিত্র্যের জন্য আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়নরা প্রকৃষ্ট মঙ্গোলয়েড। তৎসত্ত্বেও অক্ষিপুটের ভাঁজ (যদিও প্রবর্ধিত তবু নিয়মানুসারে অক্ষিকোণঝুটি যুক্ত নয়), উদ্যত নাসা, মধ্যম বা উচ্চ নাসাযোজক এবং মুখাবয়বের জন্য এরা অনেকাংশে ইউরোপিঅয়েড সদৃশ। এদের কোন কোন উপজাতির কেশ তরঙ্গিত এবং মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত।

এখানে অধ্যাপক ন. ন. চেবোক্সারভ কৃত (১৯৫১) মানুষের জাতিসমূহের শ্রেণীবিন্যাসের একটি ছক উদ্ধৃত হল।

মহাজাতি	জাতি	নৃজাতিরূপ বর্গসমূহ
নিগ্রোয়েড (নিরক্ষীয়)	নিগ্রোয়েড (আফ্রিকান)	দক্ষিণ আফ্রিকান (বুশম্যান) মধ্য আফ্রিকান (পিগমি) সুদানী (নিগ্রো) পূর্ব আফ্রিকান (ইথিওপীয়)
	অস্ট্রালয়েড (মহাসাগরীয়)	আন্দামানী (নেগ্রিটো) মেলানেশীয় অস্ট্রেলীয় (আদিবাসী) কুরিল (আইনু) শ্রীলঙ্কা-জোন্দ্ (ভেদ্দী)
ইউরোপিঅয়েড (ইউরেশিয়ান)	দক্ষিণ ইউরোপীয় (ভারত-ভূমধ্যসাগরাঞ্চলীয়)	দক্ষিণ ভারতীয় (দ্রাবিড়) অন্তর্বর্তী দল দূর-এশীয় ভূমধ্যসাগর-বল্কান আটলান্টো-কৃষ্ণ সাগরীয় অন্তর্বর্তী দল পূর্ব ইউরোপীয় অন্তর্বর্তী দল

মহাজাতি	জাতি	নৃজাতিরূপ বর্গসমূহ
	উত্তর ইউরোপীয় (আটলাণ্টো-বল্টিক)	আটলাণ্টো-বল্টিক শ্বেত সাগর-বল্টিক
মঙ্গোলয়েড (এশীয়-আমেরিকান)	উত্তর মঙ্গোলয়েড (এশীয় মহাদেশীয়)	উরালীয় অন্তর্বর্তী দল দক্ষিণ সাইবেরীয় অন্তর্বর্তী দল মধ্য এশীয় সাইবেরীয় (বৈকাল) সুমেরু অঞ্চলীয় দূরপ্রাচ্য দেশীয় (পূর্ব এশীয়)
	দক্ষিণ মঙ্গোলয়েড (এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরাঞ্চলীয়)	দক্ষিণ এশীয় পলিনেশীয় অন্তর্বর্তী দল
	আমেরিকান (আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান)	উত্তর আমেরিকান মধ্য আমেরিকান প্যাটাগোনীয়

৫। সকল জাতির সাধারণ অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উত্তরণ সম্ভব যে বিভিন্ন নৃবর্গের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভিন্নতা সত্ত্বেও জাতিসমূহ পরস্পরঘনিষ্ঠ এবং এ নৈকট্য তাদের বাহ্য অবয়বেও সুচিহ্নিত।

অঙ্গসংস্থান-বৈশিষ্ট্যে সদৃশ মোটামোটি বৃহদায়তন জীববর্গের জনসমষ্টিই মানুষের জাতি রূপে সনাক্ত। এসব জাতি এক উৎসজাত এবং ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ফল রূপে বিবেচ্য নয়। এদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট চারিত্র্যে চিহ্নিত, কিন্তু এসব বংশানুক্রমিক দেহলক্ষণ পরিবর্তনশীল অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের এক জটিল যৌগবিশেষ। প্রাকৃতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার যৌথ প্রভাবেই জাতির বিকাশ ঘটে। অতঃপর যদিও এই অনুসিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে মানুষের জাতিসমূহ সাধারণভাবে প্রাণীদের উপপ্রজাতির সমতুল্য, কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে এদের গুণগত মান স্পষ্টতই পৃথক।

যে পরিবেশগত অভিযোজনা প্রাণীজগতে অন্তঃপ্রজাতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণ মানুষের জাতিসত্তার উদ্ভবে তার ভূমিকা সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সম্ভবত প্রাচীন জাতি বিশেষভাবে এদের আদিমতম প্রতিনিধিসমূহ বহুলাংশে অভিযোজনা-উদ্ভূত। তবু মানুষের পশু-পূর্বপুরুষদের মতো তারা সে পরিমাণে কখনই পরিপার্শ্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। মানুষের বিকাশের প্রশ্নে জৈবিক কারণসমূহ অপেক্ষা সামাজিক প্রভাবকসমূহই অধিকতর কার্যকরী ছিল এবং এজন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন সেখানে ক্রমশ তাৎপর্যহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত আন্তর্বিবাহ মানুষের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা। এ পর্যায়ে মানুষ স্পষ্টতই বন্যপ্রাণী থেকে স্বতন্ত্র, কারণ প্রাণীজগতে উপপ্রজাতির উদ্ভবে সংকরণের ভূমিকা অনুল্লেখ্য। মানববিকাশের ধারা যদি একটি বৃক্ষের আকারে চিত্রিত হয় তবে দেখা যাবে শুধু নিকটবর্তীরাই নয়, দূরবর্তী শাখারাও পরস্পর-মুখী এবং আলিঙ্গন-উদ্যত।

মানুষের বংশানুক্রমিক পরিবর্তনসমূহও প্রাথমিকভাবে সামাজিক শর্তাবলী দ্বারা প্রভাবিত। এ কারণেও মানুষের জাতিসমূহ উচ্চতর প্রাণীগোষ্ঠী থেকে স্পষ্টতই স্বতন্ত্র।

সম্ভবত অবলুপ্ত ও আধুনিক মানুষের জাতিসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ এমন এক ধারার অনুসারী যা স্পষ্টতই বন্য (অথবা গৃহপালিত) প্রাণীর উপপ্রজাতির উদ্ভব-প্রকরণ থেকে পৃথক। যেহেতু জাতিসমূহের উদ্ভব মানুষের উৎপত্তির সঙ্গে অন্বিত সেজন্য পরবর্তী অধ্যায় মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ বর্ণনার জন্যই নির্দিষ্ট হল।

জাতিসমূহ ও মানুষের উদ্ভব

১। নব্যপর্যায়ের শিলীভূত মানব

নিয়ানডার্থাল-পূর্বপুরুষ থেকে যে নব্যমানবের উদ্ভব ঘটেছে এ প্রত্যয় সোভিয়েত নৃতত্ত্বে স্বীকৃত। অত্যধিক প্রাগ্রসর শিলীভূত এপ্-প্রজাতির কোন এক ধারা থেকেই আদিমতম নরগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং তারাই নিয়ানডার্থালীয়দের পূর্বপুরুষ। এ তত্ত্ব সমরূপ-উদ্ভব তত্ত্ব নামে জ্ঞাত।

কোন কোন প্রতিক্রিয়াশীল গবেষকের মতে কয়েক প্রজাতির এপ্ থেকে প্রথম আদিমতম মানবের একাধিক স্থানীয় ভেদের উদ্ভব ঘটে, পরে তারাই নিয়ানডার্থাল পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়; এই শেষোক্তদের অন্যতম ধারা থেকে মানুষের নব্য মহাজাতিসমূহের জন্ম। এ তত্ত্ব বহুরূপ-উদ্ভব তত্ত্ব নামে জ্ঞাত। বহুরূপ-উদ্ভব তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে নব্য মানুষের জাতিসমূহ বংশজনি সূত্রে পরস্পর অন্বিত নয়, তারা পরস্পর-আত্মীয় নয়। যা হোক, বহুরূপ-উদ্ভব তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

সুতরাং জাতিসমূহের উদ্ভব-সমস্যা স্পষ্টতই নব্যমানবের উদ্ভব ও বিকাশ সংক্রান্ত বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। (১৭) জাতিসমূহের মূলসত্তা আবিষ্কারের জন্য ইতিহাসের গভীরে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা অপরিহার্য। এ পথে প্রথম ক্রো-ম্যাগ্নন্ ও অন্যান্য নবপর্যায়ের শিলীভূত মানব থেকে নিয়ানডার্থাল অবধি এবং পরে আরো পেছনে আদিমতম মানব এবং এমনকি তাদেরও পূর্বপুরুষ — সেই সব অতিপ্রাগ্রসর শিলীভূত এপ্দের সন্ধানও প্রয়োজন। (১৮)

কেবলমাত্র এ ধরনের পরিক্রমার ফলেই নরসদৃশ এপ্-প্রজাতি থেকে মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন তথ্য লাভ, যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের জাতিসমূহ উদ্ভূত

বিশ্বমানচিত্রে মানুষের মহাজাতিসমূহ

গ. ফ. দেবেৎস্-এর মানচিত্র অনুসারে (১৯৬৩)
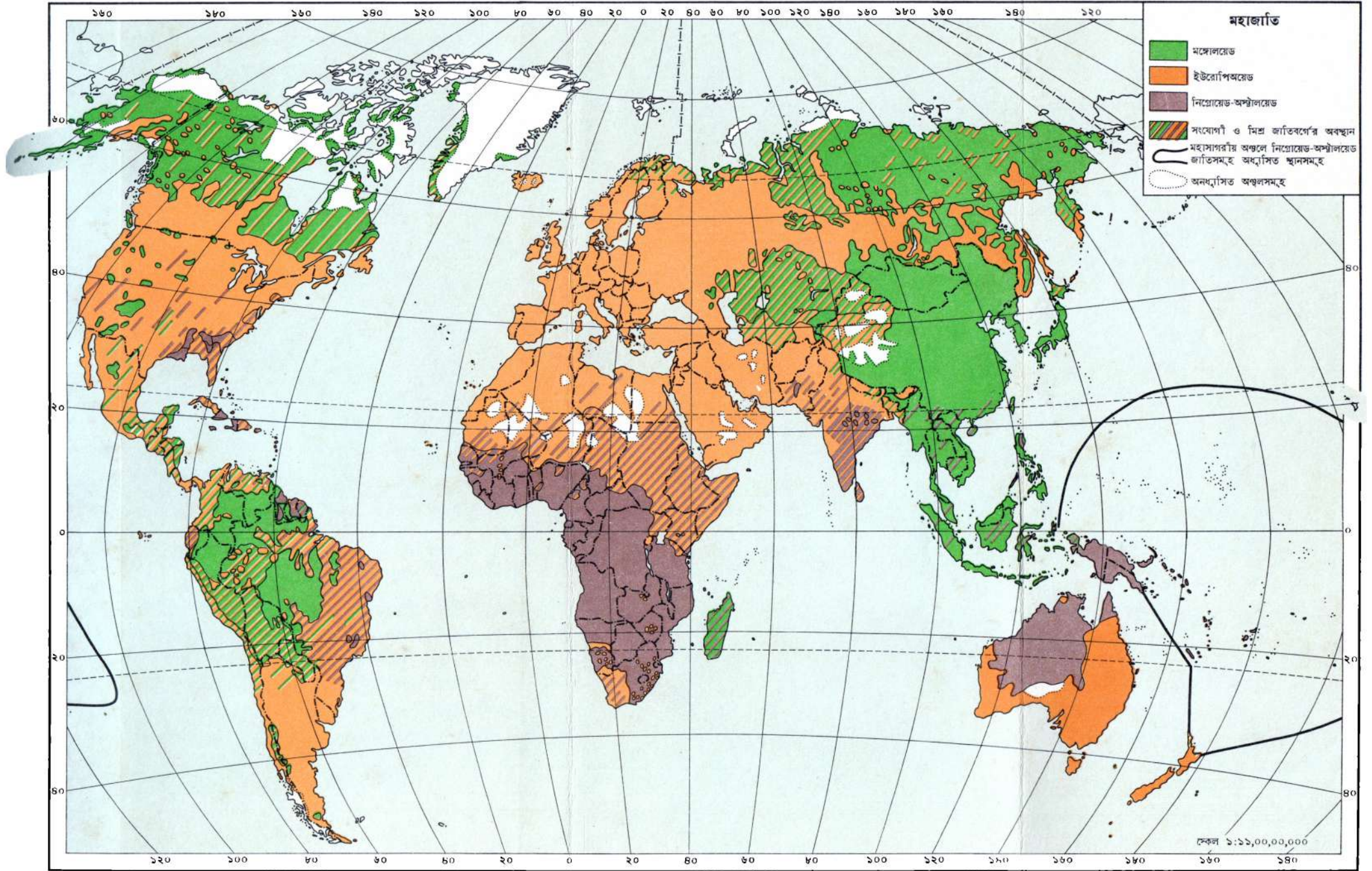
তা আবিষ্কার এবং জাতিসমূহের বিকাশের সঙ্গে প্রাণীজগতে উপপ্রজাতির উদ্ভব-প্রকরণের পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব।

হাজার হাজার বছর আগের (ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগে) এ পৃথিবীর অধিবাসী মানুষেরা দৈহিক গড়নে আমাদের সমকালীন মানুষেরই সদৃশ ছিল। এ জাতীয় মানুষের অস্থি-অবশেষ ১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগ্নন্ গ্রামের নিকটে এক গুহায় আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর এ ধরনের নিদর্শন পশ্চিম ইউরোপ (২৩ নং চিত্র), আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াতেও পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে ক্রিমিয়ার মুর্জাক-
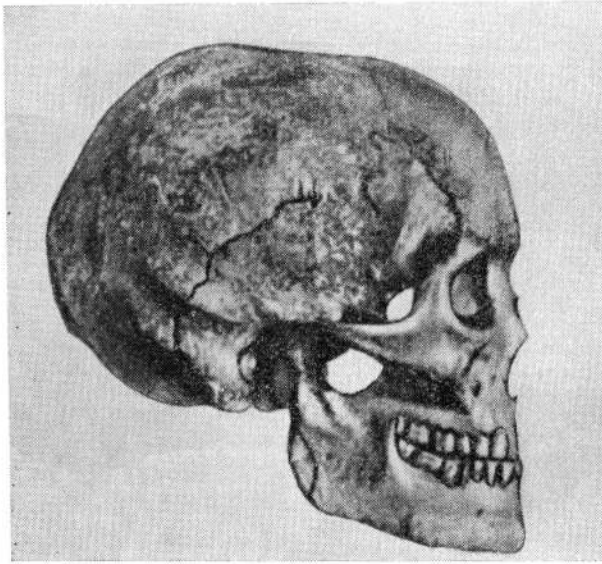
২৩ নং চিত্র: ফরাসী দেশের মেণ্টনার এন্ফ্যাণ্ট্স্ গুহায় প্রাপ্ত নরমুণ্ড

কোবা (১৯) ও ১৯২৭ সালে ফাৎমা-কোবায় (২০) ক্রো-ম্যাগ্নন্ সদৃশ মানুষের নব্যপ্রস্তরযুগীয় কংকাল আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫২ সালে ভরোনেঝ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে কোস্তিওন্কি গ্রামে খননকালে কয়েকটি কংকাল পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালে ক্রিমিয়ার বাখ্চিসারাই-এর কাছে স্তারোসেলিয়ে-তে ঝুলন্ত পাহাড়চূড়ার নীচে একটি আঠারো মাসের শিশুর কংকাল আবিষ্কৃত হয়। (২১) এ ধরনের যে সব মানুষের কংকাল ইউরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে তারা

ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ মানুষ নামে চিহ্নিত। ১৯৬৭ সালে ও. ন. বাদের ভ্লাদিমির শহরের উপকণ্ঠে সুনগির উপনদীর তীরে ৫৫—৬৫ বৎসর বয়সী ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের সম্পূর্ণ কংকাল আবিষ্কার করেন। গ. ফ. দেবেৎস্‌ (১৯৬৭) কর্তৃক বিশদভাবে বর্ণিত এই কংকালটির উচ্চতা ১৮০ সেঃ মিঃ এবং ওজন প্রায় ৭১ কিলোগ্রাম। মাথার খুলি থেকে এর মডেল তৈরি করেন ম. ম. গেরাসিমভ। কংকালটি ২২—২৩ হাজার বৎসরের পুরানো।

যোগ্য পণ্ডিতবর্গের মতে ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ ও নব-পর্যায়ের অন্য ফসিল-মানব নিয়ানডার্থালদেরই উত্তরসূরী। ক্রমরূপান্তরের লক্ষণ-চিহ্নিত বহু নরমুণ্ড (২৪ নং
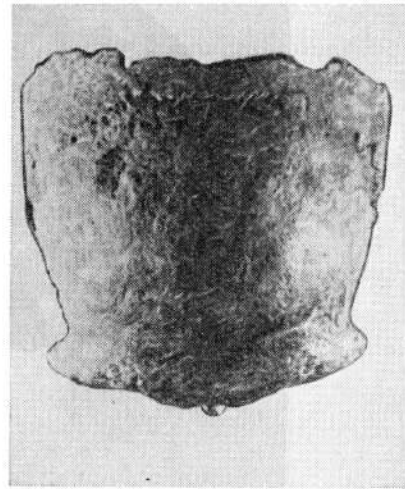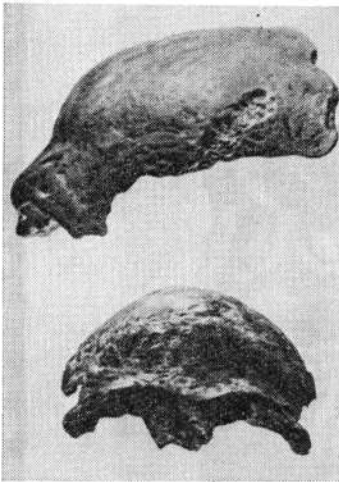
২৪ নং চিত্র: পোদকুমোক-এ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রাপ্ত
করোটির পার্শ্ব, সম্মুখ ও উপর দৃশ্য

চিত্র) আবিষ্কার এবং নব্যমানবের করোটির বহু সুচিহ্নিত নিয়ানডার্থাল-বৈশিষ্ট্য দ্বারা এ তত্ত্ব সমর্থিত। (২২)

নরমুণ্ডের গড়ন এবং নরকংকালের সামগ্রিক বিচারে মনে হয় অন্ত্য-প্রত্নপ্রস্তর যুগের নরবর্গে যে তিন প্রধান জাতির উন্মেষ ঘটে তা থেকেই বর্তমান মানুষের তিন মহাজাতি উদ্ভূত।

২। নিয়ানডার্থাল মানব — নব্যমানবের পূর্বপুরুষ

নিয়ানডার্থাল মানব আদিমতম মানুষের উত্তরসূরী এবং ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ ও তাদের সমকালীন মানুষের পূর্বপুরুষ (২৫, ২৬ নং চিত্র)। প্রাচীন বিশ্বে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ার কীক-কোবা(২৩), উজবেকিস্তানের তেশিক-তাশ গুহায় (২৪) (২৭ নং চিত্র) অস্থি-অবশেষ সহ প্রাচীন হাতিয়ারের বহু ভগ্নাবশেষ আবিষ্কারের
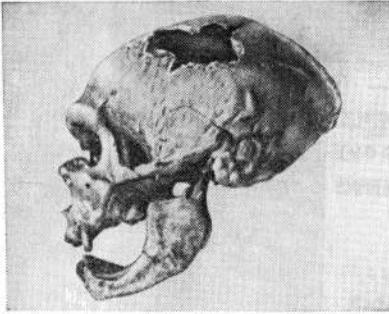
২৫ নং চিত্র: ফরাসী দেশের লা শ্যাপেল-ও-সেণ্ট-এ প্রাপ্ত নিয়ানডার্থাল মুণ্ড (১৯০৮)
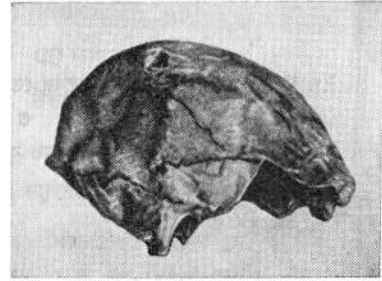
২৬ নং চিত্র: জাভার ন্‌গান্‌দং-এ প্রাপ্ত নিয়ানডার্থাল মুণ্ড (১৯৩১)

ফলেই এই আদিম মানবগোষ্ঠী এখন সুপরিচিত। নিয়ানডার্থাল মানবেরা টিকেছিল দীর্ঘদিন। এখন থেকে ৫০,০০০-৩,০০,০০০ বছর পূর্ব অবধি তাদের অস্তিত্ব ছিল।

জার্মানির নিয়ানডার্থাল উপত্যকার নামানুসারেই এই আদিম নরগোষ্ঠী চিহ্নিত। ১৮৫৬ সালে সেখানে যে নরকংকাল আবিষ্কৃত হয় তার গড়ন ছিল নব্যমানব অপেক্ষা বহুদূর স্বতন্ত্র। ডারউইনের রচনায় নিয়ানডার্থাল মানবের করোটি-গহ্বর উল্লিখিত হয়েছে।

কংকালাবশেষের মধ্যে বৃহদাকৃতির জন্য নিয়ানডার্থাল মুণ্ড বিশিষ্ট। এর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ করোটি, অত্যুচ্চ ভ্রূশিরা (অক্ষিকোটরোর্ধ্ব শিরা), ঢালু কপাল,
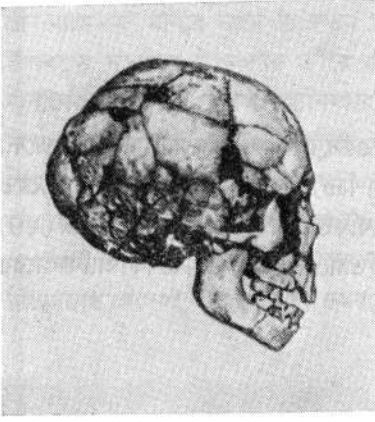
২৭ নং চিত্র: দক্ষিণ উজবেকিস্তানের তেশিক-তাশ গুহায় প্রাপ্ত নিয়ানডার্থাল বালকের মুণ্ড ও মুখ (১৯৩৮)
(ম. ম. গেরাসিমভ কর্তৃক উদ্ধারকৃত ও পুনর্নির্মিত)

অগভীর করোটি-গহ্বর। মনে হয় এ মুণ্ডের পশ্চাৎকপালাস্থি উপরের চাপেই গঠিত; এর উপরের ভারি শিরা স্কন্ধপেশীর বন্ধনীতে ব্যবহৃত। উপরের চোয়াল ও নাসাস্থির বলিষ্ঠ উত্থিতি এর অন্যতম উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। নিয়ানডার্থাল মানবের বলিষ্ঠ নিম্নচোয়াল প্রায় চিবুকশিরাবিহীন (২৫); নব্যমানব অপেক্ষা প্রায়ই এদের দন্ত-গহ্বর বৃহদায়তন।

নব্যমানবের মতো নিয়ানডার্থালেরা দীর্ঘদেহী ছিল না। এদের কংকাল অত্যধিক গুরুভার এবং এর প্রকটতর উচ্চাবচে বলিষ্ঠ পেশীর আভাস চিহ্নিত। এদের মেরুদণ্ড ঈষৎ বক্র এবং স্কন্ধ-কশেরুকা সহ এতে নরসদৃশ এপের আকৃতিই সুস্পষ্ট। এদের উরুর বক্রতা সহজদৃষ্ট ও উরুর তুলনায় পায়ের গুল খাটো এবং এজন্য মনে হয় নিয়ানডার্থাল মানব সম্ভবত যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতি ছিল না (২৮ নং চিত্র)।

নিয়ানডার্থাল মানবের করোটির ঘনমানের গড় নব্যমানবের প্রায় সমান — প্রায় ১৪০০ সিঃ সিঃ। এদের মস্তিষ্ক, বিশেষভাবে এর অগ্রাংশ নব্যমানবের তুলনায় স্বল্পবিকশিত এবং স্বল্পজটিল।

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা সহ প্রাচীন বিশ্বের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ানডার্থাল বা
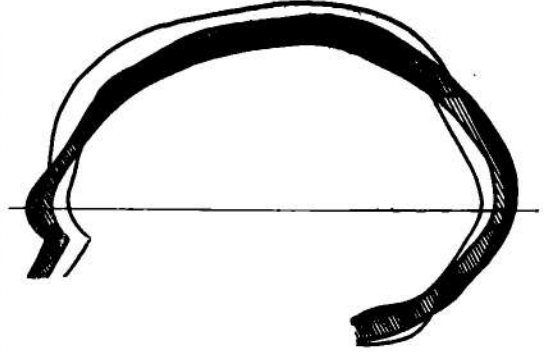
২৯ নং চিত্র: পরিকল্পনানুসারে প্রদর্শিত শিলীভূত মানবের করোটির আকৃতি

২৮ নং চিত্র: নিয়ানডার্থাল মানব (ন. আ. সিনেলনিকভ ও ম. ফ. নেস্তুর্খ কর্তৃক পুনর্নির্মিত ও স. গ. ওবোলেন্স্কি কর্তৃক অঙ্কিত)

আদিমানব অধ্যুসিত ছিল।* বসতি অঞ্চলের এ সুদূর বিস্তৃতির জন্য তাদের মধ্যে উল্লেখ্য প্রকার নৃবর্ণের উদ্ভব ঘটেছিল। (২৬) নিয়ানডার্থালদের একাধিক নৃবর্ণ বিজ্ঞান-স্বীকৃত। এদের মধ্যে অনেকেই পর্যাপ্ত মস্তিষ্কের জন্য এবং অন্যেরা স্বল্প আয়তনের করোটি সত্ত্বেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে নব্যমানবের একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিল (২৯ নং চিত্র)। মানুষের নব্যজাতিসমূহ নিয়ানডার্থাল-উদ্ভূত এ প্রত্যয় সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা অস্বীকার করেন। (২৭) যা হোক, নিয়ানডার্থালদেহী কোন নরবর্গ থেকেই নব্যমানবের জন্ম এবং অতঃপর এ থেকেই নব্যজাতিসমূহের উদ্ভব।

---

* নব্যমানবের মতো কিছু মিশ্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিয়ানডার্থাল মানবের দুটি মুণ্ড সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। এগুলি আবিষ্কৃত হয় ইরাক কুর্দিস্তানের জাগ্রোস্ক পাহাড়ের শানিদার গুহায়।

৩। আদিতম মানুষ —
নিয়ানডার্থালীয়দের পূর্বপুরুষ

নিয়ানডার্থালীয়দের পূর্বপুরুষরাই প্রাচীন বিশ্বের আদিমতম মানুষ। নিয়ানডার্থালদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে হাইডেলবার্গ মানব, আটলানথ্রপাস, টেলানথ্রপাস, সিনানথ্রপাস, পিথেকানথ্রপাস-এর নাম উল্লেখ্য। এদের অনেকেই নিয়ানডার্থালদের ঘনিষ্ঠ, অন্যেরা এপ্-সদৃশ।

আদিতম মানবেরা এপ্ ও মানুষের মধ্যবর্তী আকৃতির প্রাণী বিশেষ। মানুষের এসব শিলীভূত প্রতিনিধিরা তখনও বহুলাংশে এপ্-সদৃশ। এদের কপাল ঢালু, অক্ষিকোটরের উপরস্থ অস্থি বৃহদাকার, মস্তক অত্যন্ত অগভীর এবং চিবুক অনুপস্থিত ছিল। এসব 'মধ্যবর্তী প্রাণীদের' মস্তিষ্কের আকার ছিল নরসদৃশ এপ্ থেকে বহুদূর স্বতন্ত্র। এদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যেখানে ৯০০-১২০০ সিঃ সিঃ সেখানে এপ্‌দের বৃহত্তম প্রজাতি গরিলার মস্তিষ্ক মাত্র ৪৫০-৬০০ সিঃ সিঃ (একটি ক্ষেত্রে ৭৫২ সিঃ সিঃ)।

আদিতম মানব কাঠ, পাথর প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত বস্তুসম্ভারই শুধু হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নি, তারা ইতিমধ্যেই হাতিয়ার তৈরীতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাদের অনেকের কাছে আগুনের ব্যবহারও অজ্ঞাত ছিল না। অতএব এদের আদিতম মানব রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব।(২৮)

প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে, কোয়াটার্নারী যুগের শুরুতেই বহু এপ্-লক্ষণচিহ্নিত আদি মানবের প্রথম উদ্ভব। এ পর্যায়ে তাদের বিকাশ কাল অত্যন্ত দীর্ঘ — প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর এবং মধ্য কোয়াটার্নারীর তুষার যুগের গোড়া অবধি তা প্রসারিত।

আদি মানবের প্রথমতম দৃষ্টান্ত পিথেকানথ্রপাস (জাভা) এবং অতঃপরই সিনানথ্রপাসের (চীন) উদ্ভব। হাইডেলবার্গ মানব (জার্মানি) এদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জাতি এবং ময়ার গ্রামে এরই নিচের চোয়াল আবিষ্কৃত হয় ১৯০৭ সালে এক বালু খাদের প্রায় ২৪·১ মিটার গভীরে।

প্রকাণ্ড চোয়াল এবং চিবুকের অনুপস্থিতির জন্য প্রত্যন্তকালের (প্রায় ৪ লক্ষ বছর আগের) হাইডেলবার্গ মানব নরসদৃশ এপের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রাণী। এতদ্‌সত্ত্বেও এ চোয়ালে মানুষের বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত, যথা: ১) দন্তাবকাশহীন নিবিড় দন্তবিন্যাস ২) পেষকদন্তের পেষণ-তলের চূড়া ও খাঁজের বিন্যাস ৩) ক্ষুদ্রাকার চূড়ার জন্য ছেদন-দন্ত অন্য দন্ত অপেক্ষা দীর্ঘতর নয় ৪) হন্বস্থির অশ্বক্ষুরাকৃতি।

দুর্ভাগ্যক্রমে হাইডেলবার্গ-মানবের অন্য কোন অস্থি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। আমরা তাদের ব্যবহৃত পাথুরে হাতিয়ার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সম্ভবত তা ছিল চেলিয়ান পর্বের অনুরূপ এবং অত্যন্ত স্থূল ও আদিম। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু স্থানে ময়ারের বালু-খাদে প্রাপ্ত বস্তুসম্ভারের অনুরূপ দ্রব্যাদি পশ্বাস্থির (ম্যামথ, ইত্রুস্কীয় গন্ডার, আদিম অশ্ব) স্তূপের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ময়ার থেকে টার্নিফিন বা পলিকাও-এর দূরত্ব ২০০০ কিলোমিটার। এই শেষোক্ত স্থানদ্বয়ে (আলজিরিয়ার মাস্কারা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে) ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে অতি আদিম মানুষের তিনটি নিম্নচোয়াল (দুটি অসম্পূর্ণ) এবং মধ্যকপালীয় অস্থির একাংশ আবিষ্কৃত হয়। যে জেলায় এ অস্থিসম্ভার পাওয়া যায় তা ছিল আটলাস পর্বতের নিকটবর্তী। এ অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবে এজন্যই এদের আটলানথ্রপাস নামকরণ।

ভ. প. ইয়াকিমভের (২৯) মতে হাইডেলবার্গ মানবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য সত্ত্বেও আটলানথ্রপাসের চোয়াল এদের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। এগুলো সিনানথ্রপাস ও পিথেকানথ্রপাসের চোয়ালের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং টার্নিফিনে প্রাপ্ত অস্থি-অবশেষ এদেরই কোন একটির অন্তর্গত। আটলানথ্রপাসের কংকালাবশেষের আদিমতা তাদের ব্যবহৃত পাথুরে হাতিয়ারের (চেলিয়ান পর্বের) স্থূলত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ। এসব বস্তুসম্ভার পরবর্তী পর্যায়ের আচেউলিয়ান পর্বের প্রথম দিকের অন্তর্গত। (৩০)

১৯৪৯ সালে আফ্রিকার বিপরীত প্রান্তে অতি আদিম-মানুষের একটি কংকাল আবিষ্কৃত হয়। জোহানস্‌বার্গ থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সোয়ার্টক্রানৎস্-এর এক গুহায় জে. রবিনসন আদি প্লিস্টোসিন যুগের পলিতে একটি অসম্পূর্ণ নিম্নচোয়াল খুঁজে পান। হাইডেলবার্গ মানবের চোয়াল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হলেও এটি ছিল একই রকম পুরুষ্টু এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে এরই সদৃশ। ১৯৫০ সালে একই গুহায় প্রাপ্ত দ্বিতীয় হন্বস্থিও ছিল একই বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত। ওল্দোভাই গিরিখাতে (তানজানিয়া) লুইস লিকি আদিম মানুষ ওল্দোভাই পিথেকানথ্রপাসের মুণ্ড খুঁজে পান।

সোয়ার্টক্রানৎস্ মানবের রবিনসনকৃত নাম কেপ্-টেলানথ্রপাস। কেপ্ অঞ্চলে প্রাপ্ত এবং এপ্ নয়, সম্পূর্ণ মানুষ বলেই এর এ নামাকরণ (গ্রীক: টেলস্ — সম্পূর্ণ, নিখুঁত), যদিও অন্যেরা একে এপ্ বলেই মনে করতেন।

টেলানথ্রপাস, আটলানথ্রপাস ও হাইডেলবার্গ মানব মানববিকাশের ধারার প্রথমতম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৩১)

১৯২৯ সালে পিকিং থেকে ৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চাউকাউতিয়েনের এক গুহায় চীনা নৃতাত্ত্বিক পেই ওয়েন চুং সিনানথ্রপাসের প্রথম মুণ্ড (৩০ নং চিত্র) আবিষ্কার করেন।

পরে চীনা প্রত্নজীববিদরা একই গুহায় আরো কয়েকটি সিনানথ্রপাস মুণ্ড খুঁজে পান। এদের স্ত্রী-মুণ্ডগহ্বরের ঘনমান ছিল ৮৫০-১০০০ সিঃ সিঃ। এদের পুরুষদের মুণ্ডগহ্বর ছিল বৃহত্তর — ১২২০ সিঃ সিঃ পর্যন্ত এবং তা গোয়াহিরো ইণ্ডিয়ান (দক্ষিণ আমেরিকা) শ্রেণীর কোন কোন নব্যমানবের করোটিক আয়তনের প্রায় সমান। উন্নততর মস্তিষ্কের প্রশ্নে (ঘনমানের গড় ১০৫০ সিঃ সিঃ) পিথেকানথ্রপাসের তুলনায় সিনানথ্রপাসেরা তাদের নরসদৃশ এপ্-পূর্বপুরুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রাগ্রসর ছিল।
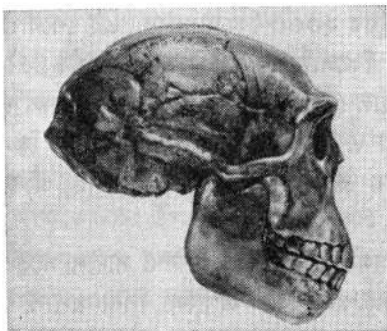
৩০ নং চিত্র: সিনানথ্রপাস মুণ্ড
(ম. ম. গেরাসিমভ কর্তৃক পুনর্নির্মিত)

মধ্যকপালাণ্ডলের স্বল্পস্ফীতি এবং একই আকৃতির অক্ষিকোটর উপরস্থ শিরার জন্য সিনানথ্রপাস মুণ্ড স্পষ্টতই নিয়ানডার্থাল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এতদ্‌সত্ত্বেও এ মুণ্ডের নিম্নাংশ সর্বাধিক প্রশস্ত, কিন্তু নিয়ানডার্থাল মুণ্ড মধ্যমাংশেই প্রশস্ততম এবং নব্যমানবের ক্ষেত্রে মধ্যকপালাণ্ডলের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও মধ্যকপালীস্ফীতির জন্য মুণ্ডের উপরার্ধই বৃহত্তম।

সিনানথ্রপাসের মস্তিষ্কের অগ্রভাগসমূহ অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিকশিত। এগুলো সামনে ও নীচে ক্রমশ সরু এবং নরসদৃশ এপের মতোই 'চঞ্চু'বৎ।

করোটির আভ্যন্তরীণ ছাঁচ থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে এর ভেতরের অস্থির উচ্চাবচ মস্তিষ্কের উত্থল অংশসমূহের সঙ্গে বহুলাংশে সাযুজ্যপূর্ণ। এর দীর্ঘ খাঁজসমূহে গুরুমস্তিষ্কের রক্তবাহী শিরাসমূহ অবস্থিত ছিল। ঘন মস্তিষ্কাবরণীর জন্য যেখানে তাজা মস্তিষ্কের কুণ্ডলীসমূহেরই পার্থক্য নির্ণয় কঠিন সে ক্ষেত্রে ছাঁচের ভিত্তিতে সিনানথ্রপাস মস্তিষ্কের আদিমত্বের শুধুমাত্র স্থূল পরিমাপ এবং পরে নব্যমানবের মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনাক্রমেই এর মূল্যায়ন সম্ভব। গুরুমস্তিষ্কের দুই গোলার্ধের অসম বৃদ্ধি দেখে মনে হয় সিনানথ্রপাসদের (৩১ নং চিত্র) ডান হাত বাম
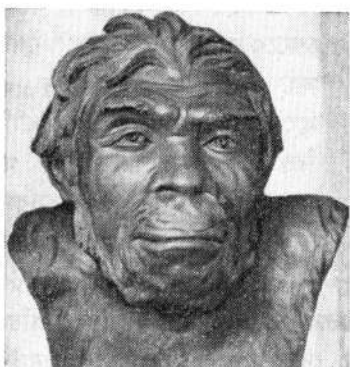
৩১ নং চিত্র: শিলীভূত মানবসমূহ

উপরের সারি: ক্রো-ম্যাগ্নন্; মধ্যসারি নিয়ানডার্থাল; নীচের সারি সিনানথ্রপাস

(ম. ম. গেরাসিমভ কর্তৃক পুনর্নির্মিত)

হাত অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় ছিল (বর্তমান শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা থেকে এ তথ্য প্রমাণিত যে, কোন কোন এপ্ গোষ্ঠীর মধ্যে ডান হাতের ব্যবহার সর্বাধিক)। সিনানথ্রপাসের মুণ্ড থেকে ম. ম. গেরাসিমভ কর্তৃক নির্মিত মডেল রক্ষিত আছে মস্কোস্থ নৃতাত্ত্বিক যাদুঘরে।(৩২)

পিথেকানথ্রপাসের আবিষ্কারের ফলে ডারউইনবাদে উল্লিখিত এর সম্ভাব্য অস্তিত্বের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়। মানুষের বিবর্তনবাদের ইতিহাসে এ আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনাবিশেষ। যদিও এ আবিষ্কারের পর আশি বৎসর অতিক্রান্ত তবু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উচ্ছ্রিত কৌতূহল আজও অবসিত নয়।
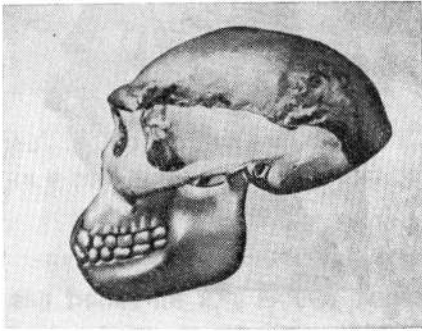
ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ইউজিন দ্যুবয় (১৮৫৮-১৯৪০) জাভার বেনগাভানের তীরস্থ ত্রিনিল গ্রাম থেকে ১৮৯১ সালে পিথেকানথ্রপাসের করোটিগহ্বর (৩২ নং চিত্র) আবিষ্কার করেন। প্রায় পাঁচ লক্ষ বছরের পুরানো এক স্তরের ১৫ মিটার গভীরে এ করোটি চাপা পড়ে ছিল।

৩২ নং চিত্র: পিথেকানথ্রপাস মুণ্ড I
(১৮৯১ সালে ই. দ্যুবয় কর্তৃক প্রাপ্ত, পুনর্নির্মিত)

ঢালু কপাল, নাসাযোজক ও ভরাট অক্ষিকোটর-উপরস্থ শিরা, ললাটাস্থির পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্য, চক্ষুকোণ থেকে ক্রমশ পেছনে সরু এর মস্তক, প্রশস্ত চূড়া, এবং মুণ্ডের নিম্নভাগের সর্বাধিক বিস্তারসহ এ মস্তকের সার্বিক গড়ন দেখে মনে হয় এ নবাবিষ্কৃত প্রাণী বহু এপ্-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এতদ্সত্ত্বেও বৃহদাকার করোটির আয়তন থেকে পরিমাপ্য এর মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল (প্রায় ৯০০ সিঃ সিঃ), গরিলা অপেক্ষা দেড় গুণ অধিক এবং এজন্যই এ রহস্যাবৃত প্রাণী বিজ্ঞানীদের দ্বারা আদি মানব রূপে স্বীকৃত। ১৮৯২ সালে দ্যুবয় কর্তৃক একখণ্ড উরু-অস্থি (প্রাপ্ত মুণ্ডের একই সমতলে এবং প্রায় ১৫ মিটার দূরে)

আবিষ্কারের পর এ মত দৃঢ়তর ভিত্তি লাভ করে। আকৃতি ও গঠনবৈশিষ্ট্যে নব্যমানবের এ অস্থি থেকে এর পার্থক্য ছিল অতি সামান্য।

দ্যুবয় কর্তৃক এর 'পিথেকানথ্রপাস ইরেক্টাস্' বা 'ঋজুমানব' নামকরণ অবশ্যই যথার্থ। দ্যুবয়ের মতে এ প্রাণী মানুষ ও এপের মধ্যবর্তী রূপান্তরমান প্রকার বিশেষ। পরবর্তীকালে জাভায় চারটি মুণ্ড ও পাঁচটি উরু-অস্থির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্তির পর দ্যুবয়ের এ সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

৪। নরাকার এপ্ — আদিতম মানবের পূর্বপুরুষ

বিজ্ঞানীদের মতে পর্যাপ্ত মস্তিষ্কধর বৃহদাকার কোন নরাকার এপ্ই আদিতম মানবের পূর্বপুরুষ। এরা ছিল উষ্ণমণ্ডলীয় (অথবা উপ-উষ্ণমণ্ডলীয়) তৃণাঞ্চলে ভূমিবাসী এবং দুপায়ে প্রায় ঋজুভাবে চলৎক্ষম।

এ অভিমত জাঁ লামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) এবং ডারউইন কর্তৃক তত্ত্বীয় পর্যায়ে তা সত্যায়িত। অস্ট্রালোপিথেকাস নামক শিলীভূত এপের আবিষ্কারের পর এ মত এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।
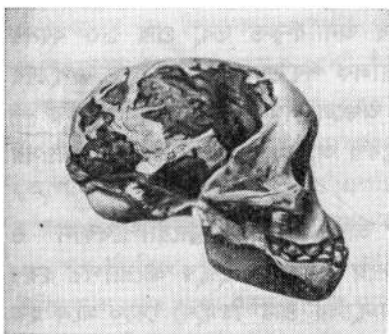
দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে টাউঙ্গ রেলস্টেশনের কাছে ১৯২৪ সালে ৩-৫ বৎসর বয়স্ক অস্ট্রালোপিথেকাস নামক একটি নরাকার এপের মুণ্ড (৩৩ নং চিত্র) আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় বিজ্ঞানী রেমণ্ড ডার্ট (৩৩) এ মুণ্ড বর্ণনা করেন এবং অতঃপর এ সম্পর্কে ব্যাপক মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কেউ একে তরুণ শিম্পাঞ্জী, কেউ বা শিশু গরিলা এবং অন্যেরা একে আফ্রিকান এপের কোন অবলুপ্ত বংশধর রূপে চিহ্নিত করেন।

৩৩ নং চিত্র: তরুণ অস্ট্রালোপিথেকাসের মুণ্ড (আফ্রিকা)

কিন্তু ডার্ট এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন যার ফলে এ আদিমানব-মুণ্ডের প্রায় সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। অপেক্ষাকৃত ঢালু কপাল, এপ্ অপেক্ষা স্বল্প প্রক্ষিপ্ত মুখাংশ, ঘনবিন্যস্ত দন্ত, অনতিদীর্ঘ ছেদন-দন্ত, পেষক-দন্তের চূড়ার নরসদৃশ শিরা ও খাঁজ এসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তিতেই ডার্ট অস্ট্রালোপিথেকাসকে মানুষের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী রূপে চিহ্নিত করেন।

পূর্ব উল্লিখিত স্থানের অদূরে স্টের্কফন্টেইন-এ অতঃপর অন্য যে মুণ্ডটি আবিষ্কৃত হয় আপাতদৃষ্টিতে তা ছিল সাবালক অস্ট্রালোপিথেক্যাসের। এ মুণ্ডের অশ্বক্ষুরাকৃতি চোয়ালের দাঁত ছিল সমদীর্ঘ। প্রিটোরিয়ার কাছে ক্রুগের্সডর্পে অস্ট্রালোপিথেকাসের ঘনিষ্ঠ দ্বিতীয় সাবালক এপ্-মুণ্ড আবিষ্কৃত ও বর্ণিত হয়। এই একই অঞ্চলে বহু প্রাণীর দন্ত, হর্ম্বাস্থি, মুণ্ড ও অন্যান্য কংকালাবশেষের যে কৌতূহলী নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় তারা ছিল অনুরূপ এপ্দেরই অন্তর্ভুক্ত। (৩৪)

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে মনে হয় কেবলমাত্র কোয়াটার্নারী যুগের প্রথম ৫ লক্ষ বছরই নয়, টার্সিয়ারীর শেষ পর্বেও বৃহৎ আকারের ভূচর, দ্বিপদ, ৫০০-৬০০ সিঃ সিঃ মস্তিষ্কের অধিকারী নরাকার এপের অস্তিত্ব ছিল। তারা উদ্ভিদ, মূল, কন্দ, শস্যদানা খেত, নানা ধরনের ছোট ও মধ্যমাকারের জন্তু শিকার করত এবং উল্লেখ্য পরিমাণ মাংসও তাদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব এপ্দের কেউ কেউ সম্ভবত সামনে পাওয়া লাঠি বা পাথর ব্যবহারও জানত।

এ ধরনের দ্বিপদ, ভূচর এপ্দের অস্থি-অবশেষ লাভের সম্ভাবনা মানুষের আদি আবাসস্থলে সম্ভব — আমাদের মতে যা মালয়, ইন্দোচীন সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল এমনকি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা অবধি বিস্তৃত।

এশীয় অস্ট্রালোপিথেকাস যদিও অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত তবু প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে দিল্লীর ৩০০ কিলোমিটার উত্তরে শিবালিক পর্বতমালায় শিলীভূত এপ্দের অস্থি-অবশেষ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর এ অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের — টার্সিয়ারী যুগের মিয়োসিন ও প্লিয়োসিন পর্বের আদিম বানর ও এপ্ বা প্রাগ্রসর বানরদের বহু দন্ত ও চোয়াল পাওয়া যায়।

নরাকার এপ্ বিশেষভাবে শিম্পাঞ্জীর আয়তনবিশিষ্ট ড্রায়োপিথেকাস ও রামাপিথেকাসের কংকালাবশেষের উপর এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। অন্যতম ড্রায়োপিথেকাসের দাঁতের আকার (মানুষের প্রায় দ্বিগুণ) দেখে মনে হয় এটি ছিল গরিলার সম আয়তনবিশিষ্ট।

শিবালিক অঞ্চলের এপ্দের মধ্যে বংশসূত্রে রামাপিথেকাসই মানুষের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে জি. ই. লুইস-প্রাপ্ত অস্থি পরীক্ষার ফলে দেখা যায়

যে, রামাপিথেকাসের দাঁত মানুষের মতো অধিবৃত্তাকার হনুবস্থিতে বিন্যস্ত। এ চোয়াল এখানে এপ্‌দের সাধারণ চোয়াল থেকে পৃথক, কারণ এর কর্তন-দন্ত, ডান ও বামের দুসার পেষক-দন্ত ইংরেজী U-অক্ষরের আকারে বিন্যস্ত, এদের দুসার প্রায় পরস্পর সমান্তরালভাবে এবং সামনের দাঁতের সঙ্গে প্রায় সমকোণে ও ছেদন-দন্ত কোণে অবস্থিত।

রামাপিথেকাস এক বা দু' কোটি বছর আগের, মিয়োসিন পর্বের শেষ দিকের ও প্লিয়োসিন পর্বের প্রথম দিকের প্রাণী এবং মানুষের উদ্ভবধারার অন্যতম যোগসূত্রস্বরূপে বিবেচ্য। সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হলে এ থেকেই হয়তো দক্ষিণ-এশীয় অস্ট্রালোপিথেকাস এবং পরে পিথেকানথ্রপাসের উদ্ভব ঘটত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত জায়গেণ্টোপিথেকাস ও মেগানথ্রপাস নামক শিলীভূত এপ্‌দের কংকালাবশেষ সম্পর্কে শেষ কয়েক দশকে বিজ্ঞানীদের ঔৎসুক্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নীচের মাড়ীর পেষক-দন্তের আকৃতি (এগুলো ২২ মিঃ মিঃ দীর্ঘ) দেখে মনে হয় জায়গেণ্টোপিথেকাস গরিলা অপেক্ষা বৃহত্তর অথবা এর সমানায়তনের প্রাণী ছিল এবং এ অর্থে তার এ নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক। প্রত্নজীববিদ জি. এইচ. আর. ফন কোনিগস্‌ওয়াল্ড হংকং-এর এক ডাক্তারখানা থেকে শিলীভূত ওরাংওটাং-এর যে ১৫০০টি দাঁত ক্রয় করেন (চীনে কোন কোন ওষুধের উপাদান রূপে প্রাণীদের শিলীভূত পেষক-দন্ত ও অস্থি ব্যবহৃত) এ থেকে জায়গেণ্টোপিথেকাসের প্রথম তিনটি পেষক-দন্ত আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্‌ৎস্‌ ভেইডেন্‌রিখ্‌ এর সঙ্গে নরদন্তের সাদৃশ্য আবিষ্কারক্রমে এই প্রকল্প (১৯৪৩) উপস্থাপিত করেন যে জায়গেণ্টোপিথেকাস জাভা-মানব বা পিথেকানথ্রপাসের পূর্বপুরুষ। ভেইডেন্‌রিখের মতে এ দুয়ের যোগসূত্র মেগানথ্রপাস নামক প্রাণী, তিনটি দাঁত সহ যার নিম্নচোয়াল ১৯৪১ সালে জাভার সাঙ্গিরানে আবিষ্কৃত হয়।(৩৫)

এর পর থেকে অদ্যাবধি জায়গেণ্টোপিথেকাসের তিনটি অসম্পূর্ণ নিম্নচোয়াল (আপাতদৃষ্টিতে দুটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীর) এবং প্রায় এক হাজার দাঁত আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রাণীর সমগ্র কংকালাবশেষই য়ুনান ও কোয়াংসি প্রদেশের গুহায় প্রাপ্ত। এ সঙ্গে মিশ্রিত বিভিন্ন জন্তুর অস্থিরাশি থেকে মনে হয় জায়গেণ্টোপিথেকাস উদ্ভিজ্জ-খাদ্যের সঙ্গে এসব প্রাণীর মাংস ভক্ষণেও অভ্যস্ত ছিল।

বৃহদাকৃতি পূর্বপুরুষদের আয়তন হ্রাস প্রক্রিয়ায় আদিমানবের উদ্ভব ঘটেছে — ভেইডেন্‌রিখের এ প্রকল্প বিজ্ঞানীদের সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৪১ সালে জাভায় প্রাপ্ত নিম্নচোয়াল ও তিনটি দাঁতের বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় মেগানথ্রপাস ও

পিথেকানথ্রপাসের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্তমান ছিল। (৩৬) যা হোক, জায়গেণ্টোপিথেকাসের অবস্থান সন্দেহাতীতভাবে মানব বংশধারার বহির্ভূত।

মানুষের বংশবৃত্তান্ত অনুসন্ধানে দূরতর অতীত পরিক্রমায় এখন মানুষ, শিম্পাঞ্জী ও গরিলার বিজ্ঞান-স্বীকৃত সাধারণ পূর্বপুরুষ ড্রায়োপিথেকাসের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

সেই সুদূর ১৮৫৬ সালেই ফরাসী দেশের সেণ্ট গডেন্‌স্‌-এ মিয়োসিন পর্বের প্রথম দিকের (২—২·৫ কোটি বৎসর) স্তরে ড্রায়োপিথেকাস নামক (৩৪ নং চিত্র) এক বৃহদাকৃতি নরাকার এপের নিম্নচোয়ালের অস্থি-অবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এ আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত ডারউইন একে মানুষ ও আফ্রিকান এপ্‌ — শিম্পাঞ্জী ও গরিলার সাধারণ পূর্বপুরুষ রূপে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে প্রাপ্ত ড্রায়োপিথেকাসের নিম্নচোয়ালের ডজনখানেক অংশ এবং বহু দাঁত পরীক্ষার ফলে এ প্রত্যয়ের যাথার্থ্য স্বীকৃত হয়।
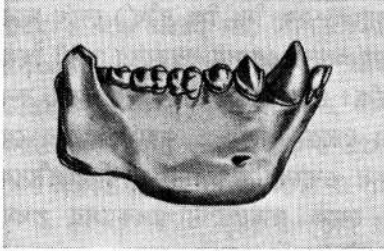
৩৪ নং চিত্র: ড্রায়োপিথেকাস ফণ্টানি-র নিম্ন-চোয়াল

এ দশকগুলিতে ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বহু স্থানে টার্সিয়ারী যুগের মিয়োসিন ও প্লিয়োসিন স্তরে ড্রায়োপিথেকাসের অনুরূপ নরাকার এপ্‌দের কংকালাবশেষের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।(৩৭)

মানুষ ও ড্রায়োপিথেকাসের জাতির্জনি সম্পর্ক শিলীভূত এপ্‌ ও ফসিল-মানবের চোয়ালের গড়ন ও দাঁতের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ণীত। ড্রায়োপিথেকাসের নিম্ন পেষক-দন্তস্থ ঘর্ষণতলের শিরার আপেক্ষিক আয়তন এবং শিরামধ্যবর্তী খাঁজের বিন্যাসে এ প্রত্যয় সমর্থিত; ইংরাজী Y-অক্ষর সদৃশ এ নক্সা এ যুগের জীবন্ত মানুষেও সহজলক্ষ্য। ড্রায়োপিথেকাসের চোয়ালের দুসারি পেষক-দন্ত প্রায় সমান্তরাল, ছেদন-দন্ত দীর্ঘতর এবং বদ্ধপাটি অবস্থায় উপরস্থ ছেদন-দন্তসমূহ নিম্নস্থ প্রাক পেষক-দন্তের ফাঁকে এবং নিম্নস্থ ছেদন-দন্তসমূহ ঊর্ধ্বস্থ ছেদন-দন্ত ও কর্তন-দন্তের ফাঁকে বিন্যস্ত থাকে।

এ ধরনের বিকশিত ছেদন-দন্ত নরাকার এপ্‌ ও অন্যান্য বানরের সাধারণ চারিত্র্য-লক্ষণ।. ছেদন-দন্তের যে প্রলম্বিত মূল তার চূড়া অপেক্ষা আজ বহুগুণ দীর্ঘ এ পর্যায় থেকেই তা মানুষের মধ্যে বংশানুক্রম সূত্রে প্রতিষ্ঠিত।

টার্সিয়ারী যুগের দ্বিতীয় পর্বের অধিবাসী নরাকার এপের প্রায় দুই ডজন প্রজাতি এখন বিজ্ঞানে সুপরিজ্ঞাত। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাব্‌্যোতে (জর্জিয়া) ১৯৩৯ সালে ইয়ে. গ. গাবাশ্‌ভিলি ও ন. ও. বুর্চাক-আব্রামোভিচ এক নরাকার এপের শিলীভূত কংকালাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই শিলীভূত নতুন এপ্‌-প্রজাতির নামকরণ করা হয় উদাব্যোপিথেকাস। (৩৮)

এ পর্যায়ের সর্বশেষ আবিষ্কার অরিওপিথেকাস ও জিন্‌জেনথ্রপাস এবং এ শিলীভূত এপ্‌দের অস্থি-অবশেষের উপর এখন বিজ্ঞানীমহলের কৌতুকদৃষ্টি নিবদ্ধ।

ইতালীর তুস্‌কেনি-র বাম্বোলি পর্বতে বিচ্ছিন্ন দন্তের নিদর্শন আবিষ্কারের পর ১৮৭২ সাল থেকেই এর প্রথম প্রাণীটি বিজ্ঞানে পরিজ্ঞাত হয়। ১৯৫৮ সালের ২রা আগস্ট তুসকেনি-র বেসিনেলো গ্রামে লিগ্নাইট খনির প্রায় ২০০ মিটার গভীরে প্রায় সম্পূর্ণ কংকালের একটি দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। এর প্রশস্ত শ্রোনীচক্র দেখে মনে হয় অরিওপিথেকাস সম্ভবত দুপায়ে চলৎক্ষম ছিল। সুইস প্রত্নজীববিদ জোহান হুর্জেলার-এর মতে অরিওপিথেকাস প্লিওসিন পর্বের প্রথম পর্যায়ের নরাকার এপ্‌ এবং মানুষের অন্যতম পূর্বপুরুষ।

অতঃপর পূর্ব আফ্রিকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নরাকার এপের অসম্পূর্ণ মুণ্ড আবিষ্কারের (১৭ই জুলাই, ১৯৫৯) ফলে বিজ্ঞানীমহলে পর্যাপ্ত কৌতূহল সৃষ্টি হয়। টাঙ্গানাইকার ওল্দোভাই গিরিখাতে খননকার্য পরিচালনাকালে এ সময় প্রখ্যাত বৃটিশ প্রত্নজীববিজ্ঞানী মেরি লিকি ও তাঁর স্বামী লুইস লিকি এ রহস্যপূর্ণ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন। এ মুণ্ডাংশ কিছুসংখ্যক অতি আদিম পাথরের হাতিয়ার সহ মাটির কয়েক মিটার গভীরে চাপা পড়ে ছিল। লিকি দম্পতি পূর্ব আফ্রিকার প্রাচীন আরবী নাম জিন্‌জ্‌-এর অনুকরণে এই নরাকার এপের নাম রাখলেন জিন্‌জেনথ্রপাস। তাঁদের মতে এ সঙ্গে প্রাপ্ত হাতিয়ারও এই নরাকার এপেরই তৈরী, যদিও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা (ভ. প. ইয়াকিমভ, ১৯৬০) এ সম্পর্কে অভিন্নমত নন। (৩৯)

. পরে লিকি দম্পতি আরো পুরানো আদি-জিন্‌জেনথ্রপাসের (বা হোমো হ্যাবিলিস — অর্থাৎ 'দক্ষ' মানব। লুইস এই নামকরণ করেন) অস্থি-অবশেষ আবিষ্কার করেন। রেডিয়াম-কার্বন প্রথায় এর বয়স নির্ণিত হয় ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর। এর কাছেই পাথরের আদিম 'হাতিয়ার' পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় হোমো হ্যাবিলিস একটি উচ্চ বিকশিত অস্ট্রালোপিথেকাস।

সন্দেহ নেই টার্সিয়ারী যুগের শেষ পর্বে এ ধরনের আরো বহুসংখ্যক নরাকার

এপদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল কিন্তু মানুষের পূর্বপুরুষ রূপে চিহ্নিত হবার সামর্থ্য ছিল শুধু এদের সর্বাধিক প্রাগ্রসর, দ্বিপদ কোন একটি মাত্র এপ্ প্রজাতির। এই সমরূপ-উদ্ভব তত্ত্বের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন এবং এ মত বহু আধুনিক বিজ্ঞানী কর্তৃক সমর্থিত।

ডারউইনের গ্রন্থাবলী প্রকাশের পূর্বে মানব ঐক্যের ধারণা ছিল কল্পনাপ্রসূত — যথা মানুষ এক দম্পতির সন্তান। বর্তমান সমরূপ-উদ্ভব তত্ত্ব অনুসারে মানুষ নরাকার এপের একটিমাত্র প্রজাতির ক্রমবিবর্তনের ফল।(৪০)

এর বিরুদ্ধবাদী বহুরূপ-উদ্ভব তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মানুষের মহাজাতিসমূহের বংশানুক্রমিক লক্ষণ-যৌগের স্থায়িত্বের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের মতে এ সব মহাজাতিসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র প্রজাতির নরাকার এপ্ থেকে উদ্ভূত। এ সব পণ্ডিতবর্গের অতিকল্পনার বদৌলতে নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড জাতি ও গরিলা একই পূর্বপুরুষজাত এবং মঙ্গোলয়েড জাতি ও ওরাংওটাং এবং ইউরোপিঅয়েড ও শিম্পাঞ্জী অনুরূপভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু সকল জাতির মানুষের অভিন্ন কলাসংস্থান ও সদৃশ শারীরবৃত্তীয় তথ্যাবলীর প্রতিপক্ষে বহুরূপ-উদ্ভব তত্ত্ব তখন পর্যুদস্ত। এ সাদৃশ্যের ভিত্তিমূল সুদূরপ্রসারী এবং এজন্য বহুরূপ-উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যের পরবর্তীকালীন অভিশ্রুতি রূপে একে চিহ্নিত করা সম্ভবত যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নয়।

৫। মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং এপ্‌সদৃশ অবয়ব

'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' জাতি-প্রত্যয় যে অলীক তা সপ্রমাণের জন্য মানুষের নব্যজাতিসমূহের অধিকতর তাৎপর্যশীল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর অনুরূপ চারিত্র্যের তুলনা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিম্পাঞ্জী ও গরিলা প্রাণীজগতে মানুষের নিকটতম জাতি রূপে চিহ্নিত।(৪১) শিম্পাঞ্জীর বিভিন্ন পরিচিত জাতির মধ্যে ১৯২৯ সালে দক্ষিণ কঙ্গো অববাহিকার অরণ্যে আবিষ্কৃত খর্বকায় বনবো জাতিই আকৃতির দিক থেকে মানুষের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ।

ড্রায়োপিথেকাস নামক মিয়োসিন পর্বের যে শিলীভূত নরাকৃতি এপ্ ডারউইনের মতে মানুষের অন্যতম ঘনিষ্ঠ পূর্বপুরুষ, তার সঙ্গে শিম্পাঞ্জী-মুখের সাদৃশ্য সম্পর্কে বহু পণ্ডিত অভিন্নমত (৩৫ নং চিত্র)।
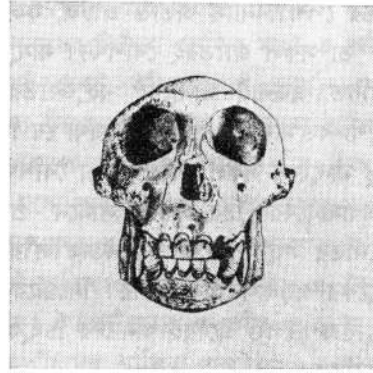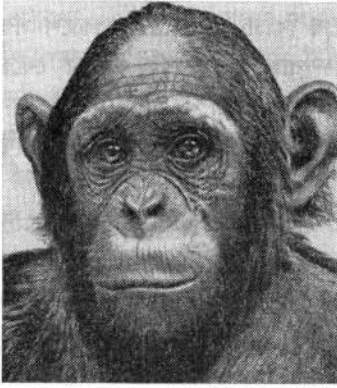
৩৫ নং চিত্র: শিম্পাঞ্জীর মুখ ও মুণ্ড

শিম্পাঞ্জীর কপাল যথেষ্ট ঢালু কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রায় সমতল। মানুষের সকল জাতির কপালই রোমহীন এবং ভ্রূরেখা সুচিহ্নিত। শিম্পাঞ্জীর অক্ষি উপরস্থ অবিচ্ছিন্ন ভ্রূশিরা ও নাসাযোজক মানুষের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অক্ষিগোলকের উপরস্থ শিরা নিয়ানডার্থাল মানবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এ সূত্রেই তারা নরাকার এপের ঘনিষ্ঠ।

শিম্পাঞ্জীর নাসা অতি ক্ষুদ্রাকৃতি, সংকীর্ণ এবং যোজক নীচু, নাসাস্থি নরম, কোমলাস্থি স্বল্প। অন্যপক্ষে মানুষের নাসা সুগঠিত, এর কোমলাস্থি সংখ্যা বহু (প্রায় এক ডজন)। এ প্রসঙ্গে নাসা-পর্দার দৃঢ় কোমলাস্থি সর্বাধিক উল্লেখ্য। নাসার কোমলাস্থি সহ নাসাস্থি, গণ্ডাস্থি এবং অন্যান্য অস্থি দ্বারাই নাসা ও নাসাপক্ষের আকৃতি গঠিত।

শিম্পাঞ্জীর ওষ্ঠপ্রান্তে রক্তিমরেখা অনুপস্থিত কিন্তু এ রেখা মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মঙ্গোলয়েড ও ইউরোপিঅয়েডে ওষ্ঠের এ রক্তিম অংশ মধ্যম অথবা সামান্য বিস্তৃত কিন্তু নিগ্রোয়েডদের ক্ষেত্রে এর প্রসার সর্বাধিক এবং এজন্যই এদের ওষ্ঠের এ স্ফীত আকৃতি। নিয়ানডার্থাল মানবের ওষ্ঠের এ অংশের সম্ভাব্য বিস্তার সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ কিন্তু আদিতম মানবে এর পরিমাপ যে অত্যন্ত খর্বিত ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ওষ্ঠের চার্ম অঞ্চল মানুষের সকল জাতি এবং শিম্পাঞ্জীতেও সুগঠিত। মানুষের

ওষ্ঠের পেশীবিন্যাস অত্যন্ত জটিল, ফলত মানুষ বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রকাশে সক্ষম এবং তা সকল জাতিরই বৈশিষ্ট্য। মানুষ ও শিম্পাঞ্জী, উভয়েরই ওষ্ঠচর্ম যেহেতু সুগঠিত এজন্যই মানুষের বহুজাতির সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর মুখভঙ্গির বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্তমান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শিম্পাঞ্জীর উপরোষ্ঠে লম্বা-খাঁদ অনুপস্থিত কিন্তু মানুষের সকল জাতিরই তা বৈশিষ্ট্য।

নব্যমানবের চিবুকাগুল সামনে প্রসারিত এবং শিম্পাঞ্জীর ও নব্যমানবের অধুনাতর পূর্বপুরুষ নিয়ানডার্থালীয়দের মতো পেছনে ঢালু নয়। মানুষের চিবুকের গড়ন বিবিধ প্রকার। নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েডদের চিবুক ক্ষেত্র বিশেষে অনুভিন্ন হলেও এদেরই অন্যদের চিবুক ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েডদের মতোই স্বাভাবিক।

এসব জাতি বা গোষ্ঠীগত বৈষম্য একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে না বলেই কোন জাতিকে শিম্পাঞ্জীর নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী বলে ঘোষণা করা এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়।

চিবুক, গণ্ড ও উপরোষ্ঠের যে রোমরাজি বহু ইউরোপিঅয়েড ও অস্ট্রালয়েডদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, ওরাংওটাং, গরিলা প্রভৃতি এপের সঙ্গে তার সাদৃশ্য যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েডদের মুখরোমের পরিমাণ অত্যল্প। মানুষের মুখে সংবেদ-কুর্চ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কিন্তু নরাকার এপের মুখে দুই তিন জোড়া এরূপ কুর্চ বর্তমান এবং তা অন্য স্তন্যপায়ীর গোঁফের সমতুল্য।

শিম্পাঞ্জী মস্তকের দিকে এবার নজর দেয়া যাক। নরমুণ্ডের সঙ্গে এর তুলনা সুবিধাজনক কারণ বিশালদেহী ও বিশেষীভূত গরিলা বা ওরাংওটাং-এর মতো এর মুখাংশ করোটির তুলনায় যথেষ্ট বৃহদায়তন নয়। শিম্পাঞ্জী মুণ্ডের শিরা, স্ফীতি ও বন্ধুরতা সহ এর বহিঃস্থ উচ্চাবচ অন্যান্য বৃহৎ এপ্‌দের মতো যথেষ্ট প্রকট নয় এবং এ অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিশেষীকৃত অবস্থারই সাক্ষ্য। এর পশ্চাদ কপালাস্থির পার্শ্বশিরা অস্পষ্ট, মধ্য কপালাস্থির সন্ধিস্থলের উল্লম্ব তীরস্থানিক শিরা — যা পুরুষ গরিলা ও ওরাংওটাং-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে অবশ্য গরিলার অনুরূপ অক্ষিগোলকের উপরস্থ প্রকট শিরা বর্তমান এবং তা অবিচ্ছিন্নভাবে নাসাযোজক অতিক্রমান্তে উভয় পার্শ্বে অক্ষিগোলকের প্রান্ত অবধি প্রসারিত।

শিলীভূত আদিমতর হোমিনিড — পিথেকানথ্রপাস ও নিয়ানডার্থাল মানবের অক্ষিগোলকের উপরস্থ শিরা প্রকটভাবে উদ্ভিন্ন। কিন্তু নব্যমানব-মস্তকের ভ্রূরেখায় এবং ললাটের পার্শ্ব-অস্থিতে এ শিরা অবলুপ্তপ্রায়।

ভ্রূরেখা এবং এ সঙ্গে যুক্ত অস্থি-সংস্থা বিশেষজ্ঞদের ভাষায় কখনো 'অক্ষিগোলকোর্ধ্ব প্রবর্ধন' নামে চিহ্নিত। মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ অস্থির উত্থিতির তারতম্য বিভিন্ন। অস্ট্রালয়েডদের প্রকট অক্ষিগোলক প্রবর্ধন থেকে মেলানেশীয়দের উৎক্ষিপ্ত ও মধ্যম এবং অন্য নিগ্রোদের অনুচ্চ ও মধ্যম ভ্রূশিরার এ বৈচিত্র্য সমগ্র নিগ্রোজাতির মধ্যে উল্লেখ্যরূপে প্রকটিত। পলিনেশীয় নৃবর্গের মধ্যে এ অস্থি মধ্যম বা অনুচ্চ, দ্রাবিড়দের মধ্যে অনুচ্চ অথবা মধ্যম কিন্তু মালয়ী ও ভেদ্দাদের মধ্যে তা অস্পষ্টপ্রায়। মঙ্গোলয়েডদের এ অস্থি সাধারণত অনুচ্চ অথবা মধ্যমাকৃতি কিন্তু এদের মধ্যে প্রকট ভ্রূশিরাও দুষ্প্রাপ্য নয়। এ বৈচিত্র্য ইউরোপিঅয়েডদের মধ্যে অধিকতর লক্ষণীয়। ইতালীয়দের এ অস্থি প্রায় অস্পষ্ট কিন্তু আর্মানী ও কোন কোন উত্তর ইউরোপীয়দের ভ্রূশিরা প্রকট।

এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এই সত্য প্রমাণিত যে, অক্ষিগোলকের উপরস্থ অস্থির গড়ন থেকে কোন মহাজাতিই আদিম হিসেবে সনাক্তীযোগ্য নয়। যেহেতু নিগ্রোয়েড জাতির অধিকাংশেরই এ অস্থি অনুচ্চ, তাই নিগ্রোয়েডরা জাতি হিসেবে ইউরোপিঅয়েড অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত এ দাবী প্রমাণে বর্ণবৈষম্যবাদীরা আজ এরূপ তথ্য ব্যবহারে অপারগ। আজও সাধারণভাবে প্রকট ভ্রূশিরাচিহ্নিত যে সব মানুষ আমাদের চোখে পড়ে যদি এ সঙ্গে তাদের কপালও ঢালু হয় তবু এদের ভ্রূশিরা কোন অর্থেই নিয়ানডার্থালের সঙ্গে তুলনীয় নয় এবং এতে আদিমতার লক্ষণও অভিব্যক্ত হয় না।

জাতিসত্তার পরিণত পর্যায় নির্ণয়ে নরমুণ্ডের গড়ন জাতিবৈষম্যবাদীদের বহুল ব্যবহৃত একটি হাতিয়ারস্বরূপ। মানুষের এ দেহাংশ নৃতাত্ত্বিকেরা বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাই এ সম্পর্কে জাতিবৈষম্যবাদীদের ভিত্তিহীন দাবী নাকচ করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

নরমুণ্ডের বহু সাধারণ বৈশিষ্ট্য — মধ্যকপাল, পশ্চাৎকপাল ও অগ্রস্থ অঞ্চল মস্তিষ্কের জটিল গড়ন দ্বারা চিহ্নিত। বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুণ্ডের অগ্রস্থ অস্থির গুরুত্ব সমধিক। আদি মানবের কপাল ছিল ঢালু কিন্তু নব্যমানবের কপাল প্রায় খাড়া।

এ থেকে মনে হয় যে কপালের ক্রমনিম্নতার কৌণিক পরিমাপ থেকে জাতিবিশেষের পরিণতির স্তর নির্ণয় হয়তো সম্ভবপর হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের কপাল-কোণের গড় ৬০·৪° এবং এস্কিমোর ক্ষেত্রে তা ৫৯·৫° অর্থাৎ এখানে অস্ট্রালয়েড ও মঙ্গোলয়েড একই পর্যায়ে অবস্থিত। এ ধরনের সংকীর্ণ কপাল-কোণ ইউরোপিঅয়েডদেরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এ

ক্ষেত্রে অ্যালসেশিয়ানদের ৬০° কোণ সবিশেষ উল্লেখ্য। এ কোণের আকারের তারতম্য ব্যাপক। এ ক্ষেত্রে ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির প্রতিনিধিরা মঙ্গোলয়েড বা অস্ট্রালয়েড অপেক্ষা কোনক্রমেই প্রাগ্রসর নয় এবং নিগ্রোয়েডদের অপেক্ষা তো নয়ই, কারণ এদের কপাল ঢালু নয় বরং বহু ক্ষেত্রে তা উত্থিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নব্যমানবের যে বিভিন্ন আকৃতির কপাল দ্বারা মস্তিষ্কের অগ্রাংশ আবৃত তা সর্বত্র সমভাবে সুগঠিত এবং এ অঞ্চলসমূহ বাকস্ফুরণ ও উচ্চতম পর্যায়ের স্নায়বিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

শিম্পাঞ্জীর ঊর্ধ্ব হনুঅস্থির সম্মুখতল প্রশস্ত। নিয়ানডার্থাল মানবের মতো এদের ক্ষেত্রেও ছেদন-দন্তের টোল অনুপস্থিত যদিও বহু নব্যমানবের খর্বিত হনুঅস্থিতে তা সুচিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মঙ্গোলয়েড মহাজাতির মানুষের মধ্যে এ চিহ্নের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট নয়।

শিম্পাঞ্জীর নিম্নচোয়ালে চিবুক-প্রবর্ধন অনুপস্থিত কিন্তু আদিম মানুষের প্রাগ্রসরতর প্রকারসমূহে এর উন্মেষ ঘটেছিল (আদিম আকৃতির)। হাইফার কাছে কার্মাল পাহাড়ে প্রাপ্ত প্যালেস্টাইন-নিয়ানডার্থাল মানবের নিদর্শনই এর দৃষ্টান্ত। চিবুক-প্রবর্ধন যে নব্যমানবের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের স্বল্প-উদ্ভিন্ন চিবুক মূলত তাদের প্রক্ষিপ্ত চোয়ালের জন্যই, চিবুক অঞ্চলের গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়।

যেকোন নরাকার এপের তুলনায় শিম্পাঞ্জীর দন্তবিন্যাস মানুষের ঘনিষ্ঠতর। প্রাচীন বিশ্বের বানরদের মতো শিম্পাঞ্জীরও দন্ত সংখ্যা বত্রিশ — উপর ও নীচের পাটির অর্ধাংশে দুটি কর্তন-দন্ত, একটি ছেদন-দন্ত, দুটি প্রাক পেষক-দন্ত এবং তিনটি পেষক-দন্ত। শিম্পাঞ্জীর ছেদন-দন্ত দীর্ঘতর, তা বিপরীত পাটির দন্তাবকাশে ন্যস্ত এবং সকল বানরের ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত। আফ্রিকার অস্ট্রালোপিথেকাস এবং ভারতীয় রামাপিথেকাস জাতীয় শিলীভূত নরাকার এপদের দন্তবিন্যাস অধিকতর সংগঠিত এবং তাদের ছেদন-দন্ত সামান্য বর্ধিত।

মানুষের সকল জাতির দন্ত সংখ্যাই বত্রিশ এবং তা ঘনবিন্যস্ত। এদের ছেদন-দন্ত দীর্ঘতর নয় ও এখানে দন্তাবকাশ অনুপস্থিত। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মানুষের প্রান্তিক পেষক-দন্তসমূহ (প্রজ্ঞাদন্ত) স্বল্পবিকশিত, কখনও একটি বা দুটি অনুদ্ভিন্ন কিংবা সম্পূর্ণ চারটিই মাড়ীর অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে। নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েড-দের কোন কোন বর্গের প্রজ্ঞাদন্তসমূহ সুগঠিত থাকে এবং তাদের চোয়ালের দীর্ঘায়ত গড়নই এর কারণ।

পূর্বপুরুষদের তুলনায় মানুষের চোয়াল ও দাঁত দুর্বলতর কিন্তু তার করোটির বিকাশ তুলনাবিহীন। মানুষের এ বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক বৃহদায়তন মস্তিষ্কের সঙ্গে

সম্পর্কিত এবং এজন্য যেকোন নরাকার এপ্ থেকে তার স্বাতন্ত্র্য সুচিহ্নিত।

বানরবর্গ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যে শিম্পাঞ্জী স্পষ্টতই মানুষের ঘনিষ্ট। (৪২)

নব্যমানবের মস্তিষ্ক অবশ্য শিম্পাঞ্জীর তুলনায় বহুগুণ বড়। সাধারণত মানব মস্তিষ্কের পরিমাপ যেখানে ১২০০-১৬০০ সিঃ সিঃ শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ক সেখানে ৩৫০-৫০০ সিঃ সিঃ মাত্র। মানুষের মধ্যে বুরিয়াতদের মস্তিষ্কই বৃহত্তম। জাতিবৈষম্যবাদীদের কথামতো যদি 'শ্বেত' জাতি 'পীত' অথবা 'কৃষ্ণ'দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তবে ইউরোপিঅয়েডদের পরিবর্তে মঙ্গোলয়েডভুক্ত বুরিয়াতরা বৃহত্তম মস্তিষ্কের অধিকারী কেন?

শিম্পাঞ্জী-মস্তিষ্কের কুণ্ডলী ও খাঁজ সুবিন্যস্ত এবং মূলত তা উন্নততর মানব মস্তিষ্কের সদৃশ। শিম্পাঞ্জীর গুরুমস্তিষ্ক-গোলার্ধের অগ্রস্থ, মধ্যস্থ ও শীর্ষস্থ কর্টেক্সের স্বল্পোন্নত অবস্থার জন্য এর মধ্যমাংশ সিলভিয়াসের ফাটে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত নয়, কিন্তু এদের বিকশিত অবস্থার জন্য মানব মস্তিষ্কের মধ্যমাংশ সম্পূর্ণ আবৃত (এ অঞ্চল রিল দ্বীপ নামে চিহ্নিত)। শিম্পাঞ্জী মস্তিষ্কের শীর্ষ ও পশ্চাৎকপাল অঞ্চলের মধ্যবর্তী এপ্-ফাট যথেষ্ট প্রশস্ত। স. ম. ব্লিনকভের(৪৩) তথ্যানুসারে (১৯৫৫) এ ফাট মানব মস্তিষ্কের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফাটের (লুনেট সালকাস) সমতুল্য।

শিম্পাঞ্জী-মস্তিষ্কের পশ্চাৎকপালের মধ্যমাঞ্চলে (অন্তঃস্থ) বর্শাকৃতি ফাট (কেলকেরাইন সালকাস) অবস্থিত এবং মানুষের সকল জাতির এ বৈশিষ্ট্য সকল শ্রেণীর এপ্‌দের মধ্যেও সুচিহ্নিত। গুরুমস্তিষ্কস্থ দৃষ্টিস্থান এ ফাটেই অবস্থিত।

মানব মস্তিষ্কের কর্টেক্স অজস্র কুণ্ডলী ও খাঁজে শিম্পাঞ্জী এমনকি নিয়ানডার্থালের তুলনায়ও বহুগুণ জটিল, যদিও শেষোক্ত ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের আকার অত্যধিক বৃহৎ।

প্রসঙ্গত মস্কোর মস্তিষ্ক গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের অন্তর্গত মস্তিষ্কের বিবর্তন সংক্রান্ত ইনস্টিটিউটে কর্মরত বিজ্ঞানীদের গবেষণা উল্লেখ্য। তাঁদের মতে বিভিন্ন জাতির মানুষের মস্তিষ্কের কুণ্ডলী ও খাঁজের আকৃতি এবং কর্টেক্সের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সংগঠনের পার্থক্য প্রায় দুর্নিরীক্ষ এবং তাৎপর্যহীন। (৪৪) এ বাস্তবতা জাতিবৈষম্যবাদীদের দাবীর সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

মানুষের মস্তকের গড়ন থেকেই সাধারণত তার জাতিসত্তা নির্ণীত, কিন্তু মস্তিষ্ক থেকে জাতি সনাক্তকরণ নৃতাত্ত্বিক, শারীরস্থান বিশেষজ্ঞদেরও সাধ্যাতীত। (৪৫)

গুরুমস্তিষ্ক কর্টেক্সের প্রথম কোষ-বাস্তুসংস্থান নিরীক্ষক বিখ্যাত রুশ কলাসংস্থানবিদ ভ্লাদিমির বেৎস্ (১৮৩৪-১৮৯৪) ১৮৭০ সালে সেন্ট পিতার্সবুর্গের চিকিৎসক সমিতির এক অধিবেশনে বলেছিলেন যে, তাঁর নিরীক্ষানুসারে আফ্রিকান নিগ্রো ও ইউরোপীয়দের মস্তিষ্ক-কুণ্ডলীর মূলগত বিন্যাস-প্রকরণ অভিন্ন।

হস্ত ও পদতলের গ্রন্থি-সংকোচক পেশীর খাঁজ (ফ্লেক্সর গ্রুভ) এবং পীড়কা শিরার (প্যাপিলারী রিজ) নক্সা, বহিঃকর্ণের আকৃতি, মস্তক, দেহ ও প্রত্যঙ্গে রোমের বিস্তার ও বৃদ্ধির দিক ইত্যাদি সম্পর্কেও বহুলাংশে এ তথ্য প্রযোজ্য। অভিসৃতির ফলে এসব দেহবৈশিষ্ট্যের উদ্ভব সম্ভবপর নয়।

এ কালের মানব জাতিসমূহের দেহবৈশিষ্ট্যে নিহিত বংশানুক্রমিক এপ্-চারিত্র্যসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, কোন জাতির ক্ষেত্রেই এসব চারিত্র্য এমন পর্যায়ে প্রকট নয় যার ভিত্তিতে তাকে আদিম রূপে সনাক্ত করা সম্ভব।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আফ্রিকানদের প্রশস্ত নাসা উল্লেখ্য, কিন্তু অন্যপক্ষে এদের ঊর্ধ্ব-চোয়ালে ছেদন-দন্তের টোল সুচিহ্নিত, ওষ্ঠ পুরুষ্টু, ঘনবদ্ধ কেশ কুঞ্চিত, দেহ প্রায় রোমহীন এবং দেহের তুলনায় পা দীর্ঘতর। আফ্রিকানদের নাসা যদিও শিম্পাঞ্জীর 'ঘনিষ্ঠ' কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে ঐ জন্তুর তুলনায় তারা সরু সরল নাসা ইউরোপীয়দের অপেক্ষা 'প্রাগ্রসর', কারণ ইউরোপীয়দের ছেদন-দন্তের টোল অগভীর, ওষ্ঠ পাতলা, কেশ আন্দোলিত, মুখ ও দেহ উল্লেখ্যরূপে রোমশ এবং পদ খর্বতর।

এ প্রসঙ্গে গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে 'নেভারা' জাহাজে ভ্রমণকারী জার্মান নৃতত্ত্ববিদ এ. ভেইসবাখের সংগৃহীত তথ্যাদি উল্লেখ্য। তিনি লিখেছিলেন যে, মানুষ ও এপের মধ্যকার সাদৃশ্য কোন জাতিবিশেষে এককভাবে সমাবিষ্ট নয়, সব মানুষই অল্পাবিস্তর এই বংশানুক্রমিক সম্পর্কের সাক্ষী; এপ্দের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা অবশ্যই কোন ব্যতিক্রম নয়। অন্যভাবে বলা যায় ইউরোপীয়রা দেহবৈশিষ্ট্যে অন্য জাতি অপেক্ষা 'প্রাগ্রসর' নয়।

৬। মানুষের দেহসংস্থার মূল বৈশিষ্ট্য: হস্ত, পদ, মস্তিষ্ক

এ পর্যন্ত যে সব দেহবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা প্রধানত আলোচনা করেছি জাতিসমূহের পার্থক্য নির্ণয়ে যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মানুষ ও এপের গুণগত বৈষম্য নির্ণয়ে তা তাৎপর্যহীন।

মানুষের বিবর্তনে তার যে সব প্রত্যঙ্গের অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এখন এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য — শ্রম ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গির প্রভাবে বিকশিত মস্তিষ্ক, শ্রমের অবলম্বনস্বরূপ বিকশিত হস্ত এবং ঋজু চলনভঙ্গির প্রভাবে আকারপ্রাপ্ত পদদ্বয়।

এঙ্গেলসের মতে শ্রমই এপের নব্যমানবে রূপান্তরের মৌল কারণ। 'প্রথমে শ্রম, পরে এবং এ সঙ্গে কথা — এই দুই অপরিহার্য উদ্দীপকের প্রভাবেই এপের মস্তিষ্ক ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সার্বিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও মানুষের মস্তিষ্ক বহুগুণ বৃহৎ এবং অধিকতর সুসম্পূর্ণ।'(৪৬)

মানুষের সকল জাতির মস্তিষ্কই যে শ্রম সম্পাদনের পক্ষে সমভাবে বিকশিত এবং বাক্‌শক্তির ভিত্তিস্বরূপ অগ্রস্থ, শীর্ষস্থ, ও মধ্যকপালী অঞ্চলসমূহ সম-পর্যায়ে উন্নত — এ দাবী এখন যুক্তিসঙ্গত।

আকাদমিশিয়ন ইভান পাভলভের তত্ত্ব অনুসারে সুস্পষ্ট বাচনে উচ্চারিত শব্দাবলী দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের অন্তর্গত এবং তা কেবলমাত্র মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত। পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার যে প্রথম সংকেততন্ত্র মানুষ তার দূরাতীত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে লাভ করেছে তা এ সঙ্গে সকল উচ্চবর্গের প্রাণীতেও বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের সকল জাতির মজ্জাগত বাক্‌শক্তি ও সংবিত্তির বিকাশের ফলে এর পরিবর্তন ঘটেছে।

গুরুমস্তিষ্ক কর্টেক্সের যে অঞ্চল অঙ্গুলি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রক তার তাৎপর্য সর্বাধিক। বাক-চেষ্টাধিষ্ঠানের সংলগ্ন অগ্রস্থ কেন্দ্রীয় বলয়ের নীচে এর অবস্থান। প্রত্যেক জাতির মানুষের ক্ষেত্রেই এ অঞ্চল সুবিস্তৃত, অত্যুন্নত এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির জন্য নির্দিষ্ট 'কেন্দ্রে' পৃথকীকৃত।

শিম্পাঞ্জীর গুরুমস্তিষ্ক-কর্টেক্সের যে অংশ অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা উন্নততর পর্যায়ে বিকশিত নয়। শিম্পাঞ্জী ও অন্য এপ্‌দের হাতের অঙ্গুলি একক ও স্বতন্ত্রভাবে কার্যক্ষম নয় এবং মানুষের মতো অতি সূক্ষ্ম নির্ভুল অঙ্গুলি সঞ্চালনে তারা অক্ষম।(৪৭) কার্যকারিতার ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য অতঃপর মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর হাতের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

শিম্পাঞ্জীর হাত আঁকড়ে ধরার বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ এবং তর্জনী থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত সকল অঙ্গুলির পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যে তা অসাধারণ। বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে চলার সময় এপ্‌দের অঙ্গুলি আংটা রূপে ব্যবহৃত হয়। এদের সমগ্র হাতের তালু এবং অঙ্গুলির নীচের অংশ পর্যাপ্ত সংবেদক স্নায়ুপ্রান্তে চিহ্নিত এবং এগুলো পীড়ক অথবা গ্রাহী নক্সা দ্বারা আবৃত; এসব রেখার জন্যই গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার সময় এদের হাত

শাখাচ্যুত হয় না। এদের বৃদ্ধাঙ্গুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রায় অনুপস্থিত এবং আঁকড়ে ধরার কাজে স্বল্পব্যবহৃত। শাখা থেকে শাখান্তরে বাহুর সাহায্যে দোল খেয়ে চলার বিশেষ লক্ষ্যেই এ হাত গঠিত এবং এর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য আংটার অনুরূপ।

শিম্পাঞ্জী দক্ষ বাহুচর হলেও তার হাতের গড়ন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, মানুষের হাতের অতি ঘনিষ্ঠ এবং তা যে মূলত আঁকড়ে ধরার প্রত্যঙ্গবিশেষ এও সহজলক্ষ্য। শিম্পাঞ্জীর মতো মানুষের নখও চ্যাপ্টা এবং তার হাতের তালুর পীড়ক ও গ্রন্থিভাঁজক রেখার বিন্যাসও শিম্পাঞ্জীরই অনুরূপ। যা হোক, মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি অত্যন্ত উন্নত এবং অন্য অঙ্গুলির তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্য সহজলক্ষ্য। এ বৈশিষ্ট্য এবং সূক্ষ্ম অঙ্গুলি সঞ্চালনের ক্ষমতা সহ মানুষের হাত শ্রমের উপযোগী প্রত্যঙ্গ রূপে চিহ্নিত। মানুষের নরাকার এপশ্রেণীর পূর্বপুরুষদের হাত এতো উন্নতপর্যায়ে সুসংগঠিত ছিল না, বস্তুসম্ভার আঁকড়ে ধরা ও আটকে ধরা জাতীয় কাজের মধ্যেই তার ক্ষমতা সীমিত ছিল।(৪৮)

তাই এঙ্গেলস যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন যে, মানুষের হাত কেবল শ্রমের হাতিয়ার মাত্র নয়, সে শ্রমের ফলও। কৃতকর্মের প্রভাবেই বিবর্তনের পথে এর ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটেছে। যে শারীরস্থানিক ও শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য হস্ত কর্মোপযোগী প্রত্যঙ্গ, প্রজন্মপরম্পরায় তা বিকশিত, সঞ্চিত এবং বংশগতিতে সংক্রমিত।(৪৯)

নতুন কর্মক্ষমতা অর্জনের পরও এপসদৃশ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মানুষের হাতের আঁকড়ে ধরা ও আরোহণ করার সেই আদি ক্ষমতা আজও অব্যাহত আছে।

যে অনন্য হাত মানুষকে পশু থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে তার গঠন বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানুষের সকল জাতিই অভিন্ন এবং এর ভিত্তিতে কোন জাতিবিশেষকে আদিম অথবা প্রাগ্রসর রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

সামাজিক কারণসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী প্রভাবক — সামাজিক শ্রমের প্রভাবেই মানুষের হস্ত ও মস্তিষ্ক বিকশিত। মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষদের ভূমিচারণ কালে দেহভার বহনের দায় থেকে হস্তের মুক্তি না ঘটলে এ বিকাশ ও আনুসঙ্গিক অগ্রগতি (এপের মানবত্ব প্রাপ্তি) অবরুদ্ধ হত।

শিম্পাঞ্জীর হস্ত একান্তভাবে বৃক্ষারোহণের উপযোগী প্রত্যঙ্গবিশেষ। বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ধীরে চলা এবং ভূমিচারণের সময় শিম্পাঞ্জীর পা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনুসঙ্গিক কার্য সম্পাদন করে, কারণ এর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘতম এবং এজন্য এর আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা অদ্যাবধিও অব্যাহত। কিন্তু মাটিতে দু' হাত দু' পায়ে হেঁটে

বা দ্রুত চলার পক্ষেও এদের পা বিশেষ উপযোগী (লক্ষণীয় যে, শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলিই নয় অন্য চারটি অঙ্গুলিও দৃঢ় ও সুগঠিত)।

যেহেতু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলি অপেক্ষা প্রকট এবং দূরে অবস্থিত এজন্য শিম্পাঞ্জীর পা'কে প্রথম দৃষ্টিতে হাতের খুব ঘনিষ্ঠ মনে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর গোড়ালি দেখেই বোঝা যায় যে এ পা, হাত নয়, যদিও মূলত শাখা আঁকড়ে ধরার মধ্যেই এর উপযোগিতা সীমিত। পদাঙ্গুলির প্রশস্ত নখের জন্য শিম্পাঞ্জীর পা বহুলাংশে মানুষের সদৃশ।

মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর হাত ও পায়ের অঙ্গুলির আপেক্ষিক আকার বিভিন্ন। শুধু হাতের দীর্ঘতম তৃতীয় অঙ্গুলিই নয় শিম্পাঞ্জীর পায়ের তৃতীয় অঙ্গুলিও অন্য অঙ্গুলির তুলনায় দীর্ঘতর, অতঃপর চতুর্থ, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও প্রথম অঙ্গুলির স্থান। মানুষের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিই দীর্ঘতম (সূত্র: ১>২>৩>৪>৫), অপেক্ষাকৃত কম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অঙ্গুলিই দীর্ঘতম (২>১>৩>৪>৫)। মানুষের হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস এরূপ (১=বৃদ্ধাঙ্গুলি): ৩>৪>২>৫>১, অর্থাৎ এপের অনুরূপ, কখনও বা ৩>২>৪>৫>১। শিম্পাঞ্জীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের তুলনায় অধিকতর সুগঠিত।

মানুষের পায়ের পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন শিম্পাঞ্জীর অধিকতর ঘনিষ্ঠ। মানুষের পায়ের যে বিশেষ মাংসপেশীটি অনুচ্ছিন্ন, নরাকার এপ্‌দের ক্ষেত্রে তাই বৃদ্ধাঙ্গুলির সংযোজক পেশী। এ পেশী পার্শ্বিক ও তির্যক শিরা দ্বারা তৈরি এবং এর প্রথমটি মানুষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত খর্বিত হলেও এপ্‌দের পায়ে তাদের কার্যকরী তাৎপর্য আজও অবসিত নয়।

পায়ের অনুদীর্ঘ চাপের জন্যই মানুষের পায়ের গড়ন এপ্‌দের থেকে স্বতন্ত্র এবং এর দৃঢ় ভিত্তির ফলেই মানুষের পক্ষে দাঁড়ান ও চলাফেরা সম্ভব। এ চাপ সকল জাতির মানুষের পায়েই সুগঠিত কিন্তু শিম্পাঞ্জীর পায়ে অনুপস্থিত।

মানুষের বহু জাতি ও উপজাতি বিশেষভাবে উষ্ণমণ্ডল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকেরই পা দিয়ে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা এখনও অব্যাহত আছে। শিশুকাল থেকে খালি পায়ে চলা এবং মাটি থেকে পাথর বা অন্য কোন ছোট জিনিস তোলায় অভ্যস্ত এসব লোক সেলাই, নৌচালনা ও অন্যান্য নানা কাজে পায়ের ব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শী। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অন্য আঙ্গুলের থেকে দূরে সরান বা চেপে রাখা সম্ভবপর এবং ফলত একে বাঁকান সহজতর হয়। পায়ের অন্যান্য আঙ্গুলেও এসঙ্গে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও চলৎক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়।

ন. ন. মিক্‌লুখো মাক্‌লাই পাপুয়ানদের এ দক্ষতার চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন: 'আমি দেখেছি তারা পায়ের আঙ্গুল দিয়ে নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে, মাটি থেকে উপরে তোলে, জলে ছোট মাছ ধরে, বর্শা থেকে বড় মাছ খোলে, এমনকি কলার খোসা ছাড়াতেও পারে।'(৫০) ইউরোপীয় ও অন্যান্য জাতির মানুষ, যারা সাধারণত অত্যন্ত আঁটসাঁট জুতা পরে অভ্যস্ত তাদের পায়ের পাতার বাহ্যগঠন ও কার্যকারিতা উষ্ণমণ্ডলীয় নগ্নপদ মানুষের চেয়ে ভিন্ন।

যা হোক, সকল জাতির মানুষেরই পায়ের পাতার গড়ন ও কার্যকারিতা অভিন্ন এবং এ ক্ষেত্রে দৃষ্ট পার্থক্য, বিশেষভাবে জন্মসূত্রে লব্ধ পার্থক্য অতি সামান্য।

নব্যমানবের মতো ঋজুভঙ্গিতে চলার উপযোগী পায়ের পাতা নিয়ানডার্থাল মানবের ছিল না। নব্যজাতিসমূহের সঙ্গে তুলনায় তাদের অনুন্নত মেরুদণ্ড, স্কন্ধ ও কটির বাঁক এ অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ। নিয়ানডার্থালদের মেরুদণ্ড নব্যমানব অপেক্ষা শিম্পাঞ্জী বা অন্য নরাকার এপের অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

পরিশেষে মানুষের নব্যজাতিসমূহের ঐক্য ও জৈবিক সাদৃশ্য নির্দেশক তথ্যাবলীর সারসংক্ষেপ উল্লিখিত হল।

নব্যমানবের মস্তিষ্ক বৃহদায়তন এবং এর অগ্রস্থ অংশসমূহ সুসংগঠিত। এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যেক জাতি শুধু শিম্পাঞ্জী থেকেই নয়, নিয়ানডার্থালীয়দের থেকেও স্বতন্ত্র, কারণ এর মস্তিষ্কের অগ্রস্থ অংশসমূহ স্বল্পবিকশিত ছিল।

ক্ষুদ্রাকৃতি বৃদ্ধাঙ্গুলির জন্য শিম্পাঞ্জীর হাত সহজেই চিহ্নিত। ইউরোপিঅয়েড, মঙ্গোলয়েড, নিগ্রোয়েড মহাজাতিসমূহের সকল মানুষেরই বৃদ্ধাঙ্গুলি সুগঠিত এবং তা অন্য আঙ্গুল অপেক্ষা সর্বত্র সমভাবে প্রকটিত।

সকল জাতির মানুষের পায়ের পাতায় একটি স্থিতিস্থাপক চাপ বর্তমান এবং ভারবহনই এর কাজ, মানুষের এপ্‌সদৃশ অবলুপ্ত পূর্বপুরুষদের মতো বস্তু আঁকড়ে ধরা নয়। এসব এপ্‌দের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিল প্রকটতর এবং সম্ভবত হাতের সমান তৎপরতায় পা দিয়ে বস্তুসামগ্রী আঁকড়ে ধরার ক্ষমতাও তাদের ছিল।

অতএব মানুষের নব্যজাতিসমূহের সকলেই মস্তিষ্ক, হস্ত, পদ প্রভৃতি অসংখ্য প্রধান আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে সমপর্যায়ে উন্নীত এবং এসব প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশই ছিল মানব বিবর্তনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এগুলো এবং অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে মানুষের নব্যজাতিসমূহ তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষ নিয়ানডার্থাল মানব থেকে সমদূরে এবং নরাকার এপ্‌ থেকে অধিকতর দূরে অবস্থিত।

জৈবরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষের নব্যজাতিসমূহের ঘনিষ্ঠতা

অধিকতর প্রত্যক্ষ। রক্ত-উপাদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জাতিবিশেষের পরিচিতি নির্ণয়ের অসম্ভাব্যতা থেকেই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত।

নিগ্রোয়েড বা মঙ্গোলয়েড জাতি মানুষের ইউরোপিঅয়েড স্তরে উত্তরণের অধস্তন পর্যায় মাত্র, কোন কোন দেশের জাতিবৈষম্যবাদীদের এ ধরনের দাবী মানুষের জাতিসমূহের জৈবিক সাম্যের স্বীকৃতির যুক্তিতে এখন খণ্ডিত।

মানুষের জাতিসমূহ কিভাবে উদ্ভূত ও বিবর্তিত হয়েছে এখন এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

জাতিসমূহের উদ্ভব

১। মানুষের জাতিসমূহ — ঐতিহাসিক বিকাশের ফল

পরিবেশের প্রভাব যে জাতিসমূহের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে তা সন্দেহাতীত। আদিম মানুষের যুগে সম্ভবত এর প্রভাব প্রখরতর ছিল, কিন্তু নব্যজাতিসমূহের উদ্ভবকালে তা আর সেরূপভাবে অনুভূত হয় নি, যদিও চর্মের বর্ণবিন্যাস ও এ ধরনের কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রভাব অদ্যাবধিও সুস্পষ্ট। জাতিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব, বিকাশ, অবক্ষয় এমনকি অপসৃতির ক্ষেত্রেও জীবনধারণের সামগ্রিক অবস্থার যৌগ-প্রভাবের তাৎপর্য নিশ্চিতভাবে সর্মাধক। যে সকল পণ্ডিতবর্গের মতে অপরিবর্তনশীল বংশাণুর পুনর্বিন্যাসের ফলেই জাতিসমূহের উদ্ভব ঘটেছে এ মতবাদ তাদের বিরুদ্ধাচরণে সুচিহ্নিত।

পৃথিবীপৃষ্ঠে বিসরণকালে মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক অবস্থার সম্মুখীন হয়। প্রাণীদের প্রজাতি ও উপপ্রজাতির উপর প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হলেও মানুষের জাতিসমূহের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতার প্রভাব এত প্রগাঢ় নয়; কারণ মানুষ গুণগতভাবে প্রাণীদের থেকে আলাদা, তারা তাদের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে ও যৌথকর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার রূপান্তরে সক্ষম।

সন্দেহ নেই, মানুষের বিবর্তনকালে উদ্ভূত বহু জাতি-বৈশিষ্ট্যের অভিযোজনাগত তাৎপর্য ছিল, কিন্তু সামাজিক হেতুসমূহের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রেক্ষিতে বহুলাংশে এদের বিলুপ্তি ঘটে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্যকারিতা ক্রমক্ষয়ের মধ্যে অবশেষে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়।

নতুন নতুন অঞ্চলসমূহে প্রথমযুগে মানুষের বসতি বিস্তারের তাৎপর্য অত্যধিক, কারণ মানুষের বহু বর্গ তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস ও আলাদা ধরনের খাদ্য গ্রহণ করত। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জাতিবর্গের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি এবং আনুসঙ্গিক মিশ্রণ শুরু হয়।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিশারদের মতে আদিম মানুষের জাতিসমূহের ইতিহাসে তাদের বিচ্ছিন্নতা ও মিশ্রণের মিথষ্ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একটি বিচ্ছিন্ন বর্গ যখন সংখ্যাবৃদ্ধিক্রমে নতুন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হত তখন সে প্রায়ই অন্য বর্গসমূহের সংস্পর্শে আসত এবং তাদের মিশ্রণ ঘটত। এর ফলে তাদের পূর্বতন পার্থক্যের মাত্রা হ্রাস পেত। নৃজাতিরূপের বিভিন্ন বর্গের মিশ্রণের ফলে নব্য মিশ্র বা সংযোগী বর্গ প্রতিষ্ঠিত হত। অতঃপর তারা দূরতর জনহীন অথবা স্বল্পজনবসতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব পুনরায় তাদের উপর কার্যকরী হত, ফলত নব্য-নৃবর্ণের পৃথকীভবন ঘটত। এ ধারণা সঙ্গত যে, এ প্রক্রিয়ার অজস্র পুনরাবৃত্তি ও হাজার হাজার বছরের পরিসরেই নব্যমানবের উদ্ভব — যার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সমগ্র অনধিকৃত অঞ্চল, নতুন দ্বীপপুঞ্জ এমনকি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা মহাদেশেও জনবসতির দ্রুত প্রসার ঘটে। অবশেষে এ পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগই (১ নং মানচিত্র) মানুষের অধিকারভুক্ত হয়। এ পর্যায়ে দক্ষিণ মেরুই মানুষের সর্বশেষ সংগ্রহ। (৫১)

যদিও প্রতিকূল আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধ (উচ্চ পর্বতমালা, প্রশস্ত নদী, প্রসারিত নিবিড় অরণ্য, শুষ্ক মরুরাশি) মানুষের স্থানান্তর গমনে অবরোধ সৃষ্টি করেছে কিন্তু তা প্রতিরোধ করতে পারে নি। যে সকল প্রাকৃতিক হেতুসমূহ যেকোন প্রাণীপ্রজাতির জাতিবৈশিষ্ট্যের নির্ণায়ক, মানুষের ক্ষেত্রে সমাজসংস্থা, শ্রম, পরিধান, যন্ত্র, অস্ত্র, আগুন, পরিবহণ-ব্যবস্থা দ্বারা তা প্রতিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় মানুষের জাতিসমূহের উদ্ভব ও বন্যপ্রাণীদের প্রজাতি বা উপপ্রজাতীয় বিভাগসমূহের বিবর্তনের গুণগত পার্থক্য লক্ষণীয়।

এ সকল কারণেই জাতিসমূহ নিরীক্ষ্য ও তাদের নির্ণায়ক দেহবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ জটিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাবের পরিমণ্ডলেই জাতিসমূহের উদ্ভব, যারা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরযুক্ত। সুতরাং একটি জাতির উদ্ভব-ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট স্থানের পরিসরে বিবিধ জটিল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণসমূহ দ্বারা প্রভাবিত, বিবর্তনের গতিপথে নির্ণীত সেই জাতির উত্থান ও বিকাশের কাহিনী। এ প্রক্রিয়ায় যে সব বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যে এক একটি জাতি চিহ্নিত তাদের মিশ্রণের ফলেই নতুন যৌগসমূহের উদ্ভব ঘটে।

দেশান্তর গমন, বিচ্ছিন্নতা, সংখ্যাবৃদ্ধি, নৃবর্ণের মিশ্রণ, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন সহ প্রাকৃতিক নির্বাচনই আদিম হোমিনিডদের মধ্যে জাতি গঠন প্রক্রিয়ার মূল কারণ। অজস্র সংযোগ মাধ্যমে ও বিভিন্ন-মাত্রায় আবির্ভূত হয়ে এরাই

জাতিসমূহের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, নৃবর্ণের জালিকা-বিন্যাস বিস্তৃত করে — যা প্রথমে শ্লথ, পরে ঘনবদ্ধ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোগীবর্গ দ্বারা যুক্ত।

২। ভৌগোলিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

নিম্ন প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষের সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং তারা বিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিল, যেখানে আবহাওয়ার বিভিন্নতা ও অজস্র প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধে মানুষের সংযোগ অবরুদ্ধ ছিল। সে যুগে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দুর্ভেদ্য পর্বতমালা, গভীর ও প্রশস্ত নদী, মরু ইত্যাদি প্রতিবন্ধে বিচ্ছিন্ন জাতিবর্গের দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবর্তন আবহাওয়া এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক হেতু দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মানুষের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়সমূহে, প্রত্নপ্রস্তর যুগে বিশেষভাবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা কোন কোন নৃবর্ণের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা যুক্তিগ্রাহ্য। এরই ফলে প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যবর্তী পার্থক্য বৃদ্ধিলাভ করেছিল।

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ ও উন্নততর স্তন্যপায়ীদের সন্তান উৎপাদন পদ্ধতি, যৌনকোষের পরিপক্কতা, গর্ভধারণ, জীবদেহের গঠন-প্রকরণ এবং বংশানুক্রম-নির্ভর পরিবর্তন অভিন্ন। কিন্তু জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক, মনুষ্যবর্গ ও সমগ্র মানবজাতির বিকাশ মুখ্যত সামাজিক হেতু-নিয়ন্ত্রিত। এ পরিপ্রেক্ষিতের অনিবার্যতার জন্যই মানুষের বংশগতি প্রাণীদের এ পদ্ধতি থেকে আলাদা, ফলত মানুষের জাতিসমূহ এ গুণগত স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট।

যে সময় আদিম ও প্রথম যুগের মানুষের মধ্যে জাতিসত্তার বিকাশ শুরু হয় এদের তৎকালীন অবস্থা স্থানীয় প্রাণীদের এ পর্যায়ের সঙ্গে আংশিক তুলনীয়; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ সাদৃশ্যেরও ক্রমাবনতি ঘটে। আদিম মানুষের জাতিসমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নব্যমানব অপেক্ষা প্রকটতর ছিল — বিশেষভাবে যা নির্দিষ্ট স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত অথবা ভৌগোলিক, একান্তভাবে স্থানীয় কারণে আকারপ্রাপ্ত। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যসমূহের সর্বাধিক বিকশিত পর্যায় নির্দিষ্টসংখ্যক

নুবর্গেই শুধু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব — যারা বিশ্বের বসতি অঞ্চলের বাইরে অথবা দ্বীপপুঞ্জে, অরণ্যে, পর্বতমালার বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করে।

প্রতিবেশী বর্গসমূহের মধ্যে স্বার্থসংঘাত, সাধারণ ভাষার অনুপস্থিতি, এমনকি অভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সম্ভাব্য ও বাস্তব সংঘর্ষের জন্য মানুষের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা প্রায়ই সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হত।

এ তথ্য সহজবোধ্য যে, ভৌগোলিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রকোপে বিশেষভাবে আদিম মানুষের ক্ষুদ্রায়তন গোষ্ঠীসমূহের অনেকগুলিতে সমকালীন প্রত্নযুগের বন্যপ্রাণীদের অপেক্ষা সম্ভবত বংশগতির পরিবর্তন প্রখরতর ছিল।

প্রাণীমাত্রেই অস্তিত্বের জন্য বাস্তব্যস্থিতি স্থানে অভিযোজিত।* তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশেরই অভিযোজন-ক্ষমতা সীমিত এবং এভাবেই প্রজাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত। প্রাণীদের গঠন ও অভ্যাসের আপেক্ষিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যমুখীনতা (কালক্রমিক পরিবর্তন, অবশ্য তা সুনির্দিষ্ট) এভাবেই বিচার্য।

বিপরীতক্রমে নব্যমানবের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশেরই অভিযোজনাগত কোন তাৎপর্য নেই। তৎসত্ত্বেও অভিযোজনার কিছু চিহ্নাবশেষ এখনো সুস্পষ্ট আছে। চর্মের বর্ণবিন্যাস, অক্ষিপুটের ভাঁজ, ওষ্ঠের পুরুত্বতা, গণ্ডাস্থি অঞ্চলের চর্মতলে চর্বিস্তরের বৃদ্ধি প্রভৃতিই এর দৃষ্টান্ত। এখন অবশ্য প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের পক্ষে সভ্য কৃত্রিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় এ সব বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য অত্যন্ত সীমিত। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার উপর মানুষের প্রত্যক্ষ নির্ভরতা এখন ক্রমক্ষীয়মান এবং ক্ষেত্র বিশেষে এমনকি তা অপসৃতপ্রায়। নব্যমানবের জাতিসমূহ এবং প্রাণী প্রজাতির উপর পরিপার্শ্ব-প্রভাবের তাৎপর্য পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তৎসত্ত্বেও নির্দিষ্ট জাতিবৈশিষ্ট্য সহ মানুষের গঠনে এমন কিছু বংশানুক্রমিক চারিত্র্য আছে যা আজও পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তনশীল। ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হতে পারে, বিশেষভাবে মানুষ যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিবাসী হয়।

---

* নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জটিল যোগে অথবা এখানে অবস্থিত পরস্পরনির্ভর জীবদের মধ্যে প্রজাতিবিশেষ কর্তৃক অধিকৃত স্থানই বাস্তব্যস্থিতি স্থান। নিজস্ব জৈবিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রত্যেক প্রজাতি পরিবেশে তার উপযোগী অবস্থার সদ্ব্যবহার করে ও তদনুসারে বিবর্তিত হয়।

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের জীবনধারণের অবস্থা পৃথক তাদের বিপাকক্রিয়াও সদৃশ নয়। একই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বহু প্রজন্ম বসবাসের ফলে, লভ্য খাদ্যবস্তুর প্রভাবে কিছু কিছু জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও অন্যদের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

ভৌগোলিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মনুষ্যবর্গের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং প্রজাতি পর্যায়ে তাদের উন্নয়ন ঘটায় এরূপ সম্ভাবনা স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি এরূপ নয়, কারণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবে বিবর্তনকালে উদ্ভূত এ ধরনের বহু জাতিগত বৈশিষ্ট্য কর্মের প্রভাব, গোষ্ঠীজীবন এবং গোষ্ঠীমিশ্রণের ফলে সমতাপ্রাপ্ত হয়। ফলত, মানবসমাজে উৎপন্ন জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য প্রগাঢ়তর হয় নি। মানুষের জাতিসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রজাতি-বৈশিষ্ট্যের বহুদৃষ্ট অবলুপ্তির সঙ্গে প্রকৃতিতে সর্বকালে ঘটমান বন্যপ্রাণীর প্রজাতি-বৈশিষ্ট্যের অপ্রতিরুদ্ধ বিকাশ স্পষ্টতই বিসদৃশ।

মানবজাতি একটি জৈব একক এবং এ সামগ্রিক সত্তার এক এক অংশের নির্দিষ্ট গুণগত ঐতিহাসিক বিকাশের ফলেই এক একটি জাতির উদ্ভব; ফলত, জাতিসমূহ মূলগত তাৎপর্যে প্রাণীদের প্রজাতি ও উপপ্রজাতি থেকে স্বতন্ত্র।(৫২) শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীবন্দী দলের চারিত্র্য সুচিহ্নিত জটিল যৌগবিশেষ কিন্তু একক প্রাণীর বৈচিত্র্যের পরিমাণ সে তুলনায় সীমিত। মানুষের ক্ষেত্রে যেহেতু জাতিবৈশিষ্ট্যের চেয়ে একক বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রকট এজন্য এখানে জাতি চারিত্র্য নিরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন জনবর্গের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। মানুষের জাতিবৈশিষ্ট্যর প্রাবরণ প্রাণীপ্রজাতির তুলনায় ভিন্ন ও বিস্তৃততর এবং এজন্য তাদের পক্ষে জাতিবৈষম্য রেখা সহজেই উত্তরণ সম্ভব। এর অনুসিদ্ধান্ত এই যে, জাতিনির্ণয় প্রকরণ একক ব্যক্তির উপর সর্বদা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয় এবং কখনো কখনো এ থেকে ফল লাভও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

৩। প্রাকৃতিক নির্বাচন

আদিতম মানব ও নিয়ানডার্থাল মানবের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে অন্য হেতুসমূহ, বিশেষভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন যুক্ত ছিল। অতএব মানুষের জাতিসমূহের গঠনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকালোচনা অপরিহার্য।

কোন কোন লেখকের মতে নব্যমানবের বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ডারউইনবাদী সমাজতাত্ত্বিক সুমানবপ্রজনবাদী এবং জাতিবৈষম্যবাদীরা

এরূপ অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত মতের অনুসারী, যাদের মতে মানুষের জাতিসমূহের মধ্যে সংঘাতই মানববিকাশের ভিত্তি।

লেখকদের অন্য একটি দল এর বিপরীত মতবাদে বিশ্বাসী। তারা প্রথমতম মানবের (পিথেকানথ্রপাস ও সিনানথ্রপাস) আবির্ভাবের পর মানব-বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। আমাদের মনে হয় এই চরম মতবাদও ভ্রান্তিদুষ্ট। এই মতানুসারীরা মানুষের বিকাশের হেতু থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বর্জনক্রমে কখনও 'সামাজিক নির্বাচন' প্রত্যয়কে এর স্থলবর্তী করেন, যা ডারউইনবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের প্রিয় প্রসঙ্গ।

আদিম মানুষ ও তার জাতিবর্গের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব ক্রমপর্যায়ে মন্দীভূত হয়েছিল। অনুকূল ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক প্রভাবকসমূহ শুধুমাত্র আদিম সমাজব্যবস্থার মাধ্যমেই আদিম মানুষকে প্রভাবিত করে নি, তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবও তখন অতি তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল।

দলবদ্ধ অবস্থায় কাজ করার ফলে শুরু থেকেই মানুষের বিবর্তন বিশেষ চারিত্র্য লাভ করে ও প্রাণীজগতের অনুসৃত পথ থেকে তা স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়। দলবদ্ধ জীবন ও কর্ম অবশ্য মানুষকে প্রকৃতি-নির্ভরতা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করে নি। যে সামাজিক পরিবেশের পক্ষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের শর্তকে সম্পূর্ণভাবে অপসৃত করা সম্ভব তার বিকাশ সময়সাপেক্ষ ছিল। প্রসঙ্গত, প্রত্নপ্রস্তর যুগের আদি পর্বের আদিম ও অনুন্নত সভ্যতার, ইতিহাসের প্রারম্ভকালীন সমাজ বিকাশের নিম্নপর্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন।

এ থেকে মনে হয় মানুষের জাতিসমূহ তাদের বিকাশের আদিতম পর্যায়ে ও নিয়ানডার্থাল যুগে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গঠনমূলক প্রক্রিয়ার প্রভাবাধীন ছিল, যদিও তখন তার প্রাবল্য প্রশমিত এবং প্রভাব অপ্রত্যক্ষ। প্রাকৃতিক নির্বাচন গুণগত পর্যায়ে নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক হেতুসমূহের সহযোগী রূপে কার্যকরী ছিল কিন্তু শেষোক্তদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল।

এ প্রেক্ষিত প্রত্নপ্রস্তর যুগের প্রথম পর্বের জাতি-গঠন প্রক্রিয়া থেকে নব্যজাতিসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ বহুলাংশে পৃথক। ক্রমবিকাশের শেষতম পর্যায়ে উদ্ভূত জাতিবৈশিষ্ট্যের জটিল যৌগ শুধু অংশত অভিযোজনক্ষম ছিল; প্রাকৃতিক নির্বাচন তখন মানুষের বিবর্তনে আর কোন হেতু নয়। এসময় বংশগতিতেও বৃহৎ ও জটিল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিবিধ প্রাকৃতিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের যৌথপ্রভাবে নৃবর্গের বিভিন্ন বর্গে তখন নতুন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। বহুবিচিত্র বর্গ মিশ্রণের বিপুল প্রকরণে

নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তখন বহু নতুন জোট সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্তঃমিশ্রণ প্রকরণে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের বিস্রস্তি ঘটে এবং পরিবর্তন সম্ভাবনা অবারিত হয়।

ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের উপর প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব আর পূর্বের মতো প্রখর ছিল না কারণ ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ গোষ্ঠী ও নব্যমানবের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ শিলীভূত বর্গসমূহ তখন উন্নততর সংস্থায় দলবদ্ধ। পরিপার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক প্রভাবের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সামাজিক প্রভাবের গুরুত্ব তখন সর্বাধিক। পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ক্রমাগত ক্ষয়ের মধ্যেই জাতিবর্গের উদ্ভব, তাই মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত উভয় অর্থেই অত্যল্প পরিমাণে অভিযোজনাধীন।

৪। আন্তঃবিবাহ

মানুষের জাতিসমূহের উপর বিকশিত সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাবের অন্যতম সুদৃষ্টান্ত আন্তঃবিবাহ বা মিশ্রণ, যা বহুকাল থেকে অব্যাহত এবং বর্তমানে বিস্ময়কর পর্যায়ে উত্তীর্ণ (৩ ও ৪ নং প্লেট দ্রষ্টব্য)।

বহু মিশ্র জনগোষ্ঠী ও উপজাতি আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমান। মেক্সিকোর জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ ইউরোপীয় ও সেখানকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মিশ্রসন্ততি এবং কলম্বিয়ার জনসংখ্যার ৪০ ভাগ সম্পর্কেও একই তথ্য প্রযোজ্য।

বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে অতি সহজেই নিষেকক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে কোন শারীরবৃত্ত বা শারীরস্থানিক প্রতিবন্ধ নেই। এ ভাবে উৎপন্ন সন্তানেরা শুধু সম্পূর্ণ সুস্থই নয় তারা নিজেরাও স্বাভাবিক সন্তানের জন্মদানে সক্ষম। বিপুলসংখ্যক মিশ্র জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বে সকলেই অবহিত, যথা: ইউরোপীয় ও নিগ্রো (৩৬ নং চিত্র), নিগ্রো ও চীনা, ইউরোপীয় ও জাপানী, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়, ইউরোপীয় ও অস্ট্রেলীয়। দক্ষিণ আমেরিকায় তিন অথবা ততোধিক মিশ্র জাতির বিবরণ লিখিত হয়েছে; নিগ্রো, ইউরোপীয় ও আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

দীর্ঘকাল মিশ্রণের ফলে কোন কোন জাতি থেকে অন্তর্বর্তী সংযোগী বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। উরালীয় বর্গ (মান্‌সি ও খান্তি জনবর্গের অংশ) এর দৃষ্টান্ত। ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েডদের মিশ্রণের ফলেই এসব জনবর্গের উদ্ভব। লাপ্পা

৩৬ নং চিত্র: আবখাজ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের ওচামচিরে জেলার আব্‌জিউব্‌ঝা গ্রামের নিগ্রো ও আবখাজীয় মিশ্র পরিবার (১৯৪৯ সালে গৃহীত আলোকচিত্র) (মধ্যে উপবিষ্ট সোফিয়া মুজালিয়া, বয়স প্রায় ১১২ বৎসর, বামে তার পুত্র শিরিণ আবাশ, ডাইনে তার পৌত্র ভালেরি আবাশ; দাঁড়ানো পৌত্রী নুৎসা আবাশ ও ত্‌সিবা চাম্বা।)

অথবা সাম জনবর্গ, মারি জনবর্গ (৫ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) সম্পর্কেও এ তথ্য প্রযোজ্য। বিশ্ব মানব সমাজের অর্ধাংশ মানুষ আজ উল্লেখ্য রূপে মিশ্রজাতিভুক্ত।

যে অনায়াসে বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে আন্তঃবিবাহ সংঘটিত হয় এবং দিন দিন যে ভাবে এর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, তাদের অভিন্ন বংশোদ্ভবের এইই উল্লেখ্য প্রমাণ। যে জাতিবৈষম্য তত্ত্বে বিভিন্ন জাতির রক্তসম্পর্কের বাস্তবতা অস্বীকৃত কেবলমাত্র এ একটি তথ্যেই তার ভিত্তিহীনতা প্রকটভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

মিশ্রজাতির সন্তানদের জাতিবৈশিষ্ট্যের অধিকাংশ লক্ষণই মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রকট এবং নৃতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক তা যথাযথ প্রমাণিত সত্য। কালক্রমে সংযোগী বর্গসমূহ স্থায়ী বর্গে রূপান্তরিত হয়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কোন জাতিবিশেষের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই প্রায়শ জাতিমিশ্রণ ঘটে; রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের মাধ্যমেই এরা পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীসমূহকে বেষ্টন ও আত্তীকৃত করে।

জাতিসমূহের মিশ্রণজনিত প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নব্যজাতিসমূহ কোন প্রজাতি সৃষ্টির মধ্যবর্তী স্তর নয়। যখনই কোন জাতির উদ্ভব ঘটে তখনই অন্য জাতির সঙ্গে তার মিশ্রণ শুরু হয়। দূর অতীতে কোন কোন জাতি যে অধিকতর পূর্ণতায় বিকশিত হয়েছে এমন সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু এমনকি তখনো, পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় দুর্বলতর হলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ জাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ অথবা তাদের বৈশিষ্ট্য-যৌগের কোনটির বৃদ্ধি এবং অন্যটির বিলয় মাধ্যমে জাতিগঠন-প্রকরণকে প্রভাবিত করেছে। এ থেকে জাতিসমূহের মধ্যে দৃষ্ট পার্থক্যের আংশিক ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব; অধিকন্তু জাতিসমূহের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের মান মিশ্রণ-প্রকরণে তাদের অন্তর্ভুক্তি পরিমাপের শর্তাধীন।

ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগে যে আন্তঃবিবাহের শুরু এবং পরবর্তী সহস্র বৎসরে ক্রমাগত যার বৃদ্ধি তারই ফলে (এবং এখনো তা অব্যাহত) মাধ্যমিক বর্গের উদ্ভব ক্রমাগত ব্যাপকতর হয়েছে এবং একই সদৃশজাতি রূপে এরা পরিণতি লাভ করেছে। সুতরাং জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য বিকাশের ক্ষেত্রে অতঃপর আন্তঃবিবাহের তাৎপর্য সীমিত হয়ে পড়ে।

সুমেরু অঞ্চলীয় (এস্কিমো), পিগমি, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীসমূহের নৃজাতি দীর্ঘকাল পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এজন্য তাদের জাতি-চারিত্র্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত। এতদ্‌সত্ত্বেও বিগত পাঁচশো বছরে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিছিন্ন এই বর্গসমূহ তাদের তথাকথিত 'জাতিগত শুদ্ধতা' হারিয়েছে, ফলত আজ আর কোথাও যথার্থ কোন 'শুদ্ধ' জাতির অস্তিত্ব নেই। 'শুদ্ধ জাতি' জাতিবৈষম্যবাদীগণ কর্তৃক আবিস্কৃত অতিকথামাত্র এবং তা বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধী। জাতিগত 'শুদ্ধতা' বা জাতিমিশ্রণের মান কখনই সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করে নি।

আজকের পর্যায়ে না হলেও সম্ভবত শিলীভূত মানবদের মধ্যেও মিশ্রণ ঘটেছিল। প্যালেস্টাইনের কার্মেল পাহাড়ের এস্-স্খুল্ ও এত্-তাবুন গুহায় প্রাপ্ত নিয়ানডার্থালীয়দের (৩৭ নং চিত্র) মধ্যে এ ধরনের নজির পাওয়া সম্ভব যেখানে এসব আদিম মানুষের মধ্যে দেহবৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য পরিদৃষ্ট। নিয়ানডার্থালীয়েরা অথবা তাদের সন্ততিগণের সঙ্গে সম্ভবত এ সময়ে বিকাশমান নব্যপ্রকৃতির মানুষের মিশ্রণ ঘটেছিল।

আন্তঃবিবাহের ফলে অধিকাংশ জাতিবর্গের মধ্যবর্তী সীমারেখা এখন নিশ্চিহ্ন। এরূপ মনে করা সঙ্গত যে, নৃবর্ণ ও তাদের বর্গসমূহ জাতি ও মহাজাতির তুলনায়

ইউরোপিয়ান-নিগ্রো

নিগ্রো-চুকচা

ইংরেজ-পলিনেশীয়

ওলন্দাজ-মালয়ী

ইউরোপিঅয়েড, নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড ও মঙ্গোলয়েড জাতিসমূহের প্রতিনিধিবর্গের আন্তর্বিবাহজাত সন্ততি

রুশ-বুরিয়াত (পুরুষ)

রুশ-বুরিয়াত (নারী)

ইতালীয়-জাপানী

স্পেনীয়-আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান

ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েড জাতিসমূহের প্রতিনিধিবর্গের আন্তর্বিবাহজাত সন্ততি
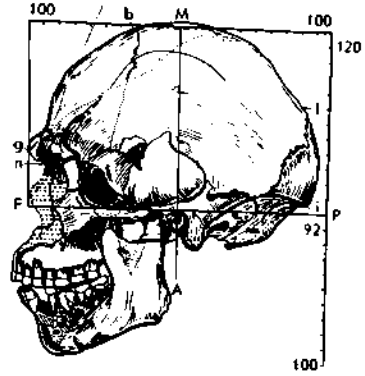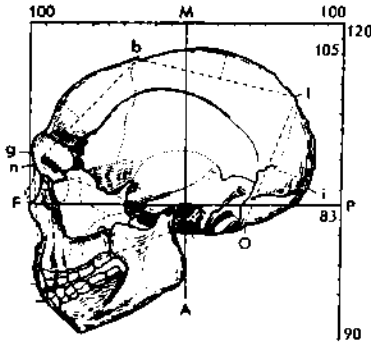
৩৭ নং চিত্র: এত্-তাবুন বামে ও এস্-স্খুল্ (ডাইনে) গুহায় প্রাপ্ত নিয়ানডার্থাল মুণ্ড FP — ফ্রাঙ্কফুর্ট এনথ্রপোমেট্রিক হরাইজন্টাল; MA — চূড়া থেকে কাণের মধ্যে দিয়ে টানা লম্ব; n — নাসাবিন্দু (ন্যাসিয়ন); g — অগ্রস্থবিন্দু (গ্ল্যাবেলা); b — অগ্রস্থ তির্যক ও মধ্যকপালী অনুদীর্ঘ (স্যাজিট্যাল) সন্ধিরেখার (ব্রেগ্মা) ছেদবিন্দু; l — স্যাজিট্যাল ও তির্যক পশ্চাৎকপাল সন্ধিরেখার (ল্যাম্ব্ডা) ছেদবিন্দু; i— পশ্চাৎকপাল তির্যক শিরার পশ্চাৎ-নিম্নস্থ (ইনিয়ন) প্রান্তবিন্দু; o — পশ্চাৎকপাল-বিবরের (অপিস্থিয়ন) পশ্চাৎ-মধ্য শিরার উপরস্থ বিন্দু; মিলিমিটারে পরিমাপ।

অধিকতর দ্রুত মিশ্রিত ও বিলীন হবে। যেখানে কোন মহাজাতির বহুজন একত্র ঘনবদ্ধভাবে বসবাসী যেমন চীনারা অথবা এস্কিমো বা পিগমিদের মতো যারা বিচ্ছিন্ন স্থানের অধিবাসী তাদের পক্ষে জাতিমিশ্রণ পরিহার অংশত সম্ভব।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে মনে হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এ যুগে সংকরণের তাৎপর্য সমধিক বিবেচিত হবে যখন অনেকগুলি দেশে জাতিবৈষম্যের প্রতিবন্ধ আজ অপসৃত অথবা অপসরণের পথে। এ থেকে আমরা আরও একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, জাতিগঠনের যেকোন হেতুর প্রভাব মানবসমাজের বিকাশের পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে। কোন এক সময় প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচন জাতিগঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জাতি ও নৃবর্ণের মিশ্রণ এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। এখন একথাও বলা সম্ভব যে, জাতিগঠনের ক্ষেত্রে জাতিমিশ্রণের ভূমিকা শূন্যপর্যায়ে এবং আজ তা জাতিবৈষম্য অপসরণের উপাদানে পর্যবসিত।

আলোচিত বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ: মানুষ ও তার জাতিসমূহের বিকাশ বিবিধ কারণপ্রভাবিত এবং তন্মধ্যে শেষপর্যায়ে জৈব-কারণসমূহ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত, ফলত এদের কোন কোনটির কার্যকারিতা এখন বিলুপ্ত।

জাতিগঠনের উপর প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যার বিশ্লেষণে এ দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণীয়। প্রথমতম নরগোষ্ঠী ও নিয়ানডার্থালীয়েরা প্রকৃতির প্রখর প্রভাবাধীন ছিল এবং যেহেতু তখনও প্রাকৃতিক নির্বাচন সক্রিয় তাই তাদের জাতিবৈশিষ্ট্য ছিল অধিকতর অভিযোজনোপযোগী। মহাজাতিসমূহের গঠনে প্রকৃতির প্রভাব ছিল সীমিত, যদিও তা আজও দুর্লক্ষ্য নয়। আজকের ক্ষুদ্রতর জাতিসমূহ এবং অ-সংযোগী বর্গসমূহের উপর প্রকৃতির সীমিততর প্রভাব সহজলক্ষ্য এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত সামাজিক অবস্থার প্রভাবেই বিকশিত।

নৃজনন ও জাতি-জননের উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক হেতুসমূহের আপেক্ষিক প্রভাব পরিবর্তিত হয়, উভয়ই যুগ্মভাবে এর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এ প্রক্রিয়া ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

৫। মহাজাতিসমূহের উদ্ভব

মানুষের জাতিসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং আমরা এখনো এ সমস্যার পূর্ণ সমাধানের সমীপবর্তী নই। সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা উল্লেখ্য স্পষ্টতায় এ প্রক্রিয়ার সাধারণ রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। আমরা এখানে জাতির উদ্ভব, তাদের মূল আবাস, বিসরণপন্থা এবং পরস্পর আত্মীয়তা সম্পর্কে আধুনিক ধারণাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত করব।

ইয়া. ইয়া. রগিন্‌স্কির (৫৩) মতে প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে মানুষের আদি আবাস অর্থাৎ এশিয়া এবং তৎসংলগ্ন আফ্রিকা ও ইউরোপের কোন অঞ্চলে সম্ভবত নিয়ানডার্থালদের নব্যমানবে রূপান্তরের অন্যতম শেষ পর্যায়ে দুটি মূল জাতি, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ধারার উদ্ভব ঘটে। তারা তখন হিন্দুকুশ, হিমালয় ও ইন্দোচীনের বিশাল পর্বতমালার প্রতিবন্ধে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। (৫৪)

ইউরোপিঅয়েড ও নিগ্রোয়েড মহাজাতির উদ্ভব দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা থেকে এবং এদের ক্ষুদ্র জাতিসমূহ উত্তর-পূর্ব দিক ছাড়া অন্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

উত্তর-পূর্ব শাখা থেকে মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উদ্ভব। শুরুতে এদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নি। পরবর্তীকালে এরা কয়েকটি ক্ষুদ্রতর জাতিতে বিভক্ত হয়, যথা — মহাদেশীয় (উত্তর মঙ্গোলয়েড, ৩৮ নং চিত্র), প্রশান্ত মহাসাগরীয় (দক্ষিণ মঙ্গোলয়েড) এবং আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান। আমেরিকার মঙ্গোলয়েডরা বর্তমান বেরিং প্রণালীর শুষ্ক অঞ্চল দিয়ে নব্যবিশ্বে প্রবেশ করে। মঙ্গোলয়েড জাতির এ ত্রিধারা থেকেই পরবর্তীকালে এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের নৃবর্গসমূহ উদ্ভূত।

৩৮ নং চিত্র: এভেংক্ (তুঙ্গুস)
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা)

মঙ্গোলয়েড মহাজাতি আজ উরালীয় (উরাল-ল্যাপানয়েড), পশ্চিম সাইবেরীয় ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপীয় জাতিবর্গ দ্বারা ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির সঙ্গে সংযুক্ত। ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েডদের সংকরণের ফলেই যে উরালীয় বর্গের উৎপত্তি, এ ধারণায় আস্থা স্থাপন যুক্তিসম্মত। যেহেতু এই দুই মহাজাতি এক উৎসস্থল ও একপূর্বপুরুষ উদ্ভূত, তাই তাদের মধ্যে সুপ্রাচীন ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সম্ভাব্য অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য নয়। তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষদের প্রটো-মঙ্গোলয়েড ও প্রটো-ইউরোপিঅয়েড বলা যেতে পারে। উত্তর-পূর্ব প্রটো-মঙ্গোলয়েড জাতি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ব্যতীত সম্ভবত অন্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল।

সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকগণ সমর্থিত মুখ্য জাতিসমূহের উদ্ভব তত্ত্বের ইহাই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্‌ৎস্ ভেইডেন্‌রিখ্ প্রমুখদের বহু-কেন্দ্রিক তত্ত্বের ইহা বিরোধী। তাঁর মতে বহুদূর পরস্পরবিচ্ছিন্ন ইউরোপ, আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াস্থ নিয়ানডার্থালীয়দের স্থানীয় জাতি থেকে নব্যজাতিসমূহ

উদ্ভূত। (৫৫) ভাষান্তরে তাঁর মতে বিভিন্ন কেন্দ্রাঞ্চল থেকে স্বতন্ত্রভাবে জাতিসমূহের উৎপত্তি ঘটেছে।

এক-কেন্দ্রিক উদ্ভবের সমর্থনে ইয়া. ইয়া. রগিনস্কি (৫৬) কিছুসংখ্যক নতুন তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি মস্কোস্থ নৃতাত্ত্বিক যাদুঘরে রক্ষিত কিছুসংখ্যক নব্য ও শিলীভূত হোমিনিডদের মুণ্ড পরীক্ষা এবং এ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর ব্যাপক বিশ্লেষণক্রমে প্রমাণ করেছেন যে, কোন অঞ্চলবিশেষে প্রাপ্ত নিয়ানডার্থাল মানব ও শিলীভূত নব্যমানবের মধ্যে প্রত্যক্ষ বংশ-সম্পর্কের লক্ষণাবলী অনুপস্থিত, অথচ বহু-কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্বের পক্ষে যার অপরিহার্যতাই আকাঙ্খিত ছিল।

নিয়ানডার্থালীয়দের মধ্যে অনুপস্থিত নব্যমানবের এরূপ অজস্র অভিযোজনাহীন আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এ ধারণার স্বপক্ষে অন্যতম প্রধান যুক্তি। এ সব বৈশিষ্ট্য, যাদের অনেকগুলিই সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তাদের স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল বিকাশ ভেইডেনরিখের স্থানীয় নিয়ানডার্থাল জাতি থেকে নব্য জাতিসমূহ উদ্ভবের তত্ত্বকে অবিশ্বাস্য প্রমাণিত করে। সুতরাং বহু-কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব স্পষ্টতই নৃতাত্ত্বিক তথ্যসমর্থিত নয়। প্রসঙ্গত ইয়া. ইয়া. রগিনস্কির (৫৭) মত উল্লেখ্য যে, নব্যপর্যায়ের মানবের জন্ম বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে এবং তা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত নয় — এই শেষোক্ত ধারণা সমরূপ-উদ্ভব তত্ত্বের বুর্জোয়া সমর্থকরা আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; এই বিশাল অঞ্চলে অধিকন্তু বহু জাতির মিশ্রণ ও মাধ্যমিক প্রকারসমূহের ধারাবাহিক উদ্ভব ঘটেছিল।

সর্বশেষ আবিষ্কার থেকে এ তথ্য প্রমাণিত যে, মানুষের আদি আবাস বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং কোন সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রাঞ্চলে মহাজাতিসমূহ আকার প্রাপ্ত হয় নি। নির্দিষ্ট আবাসস্থল সম্পর্কিত এ প্রশ্নের মীমাংসা ভবিষ্যতে বহুসংখ্যক শিলীভূত হোমিনিডদের সম্ভাব্য আবিষ্কারের উপরই নির্ভরশীল।

এখন সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাজাতিসমূহের উদ্ভব সংক্রান্ত সমস্যার পর্যালোচনা করা যাক।

৬। ইউরোপিঅয়েড মহাজাতি

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা বেষ্টিত বিশাল ভূখণ্ডেই ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির মূল আবাস ছিল — ইহাই বোধ হয় সর্বাধিক

গ্রহণযোগ্য প্রত্যয়। সম্ভবত স্তেপের অংশবিশেষ, মধ্য এশীয় পর্বতের সানুদেশ, এশিয়ার অগ্রবর্তী অঞ্চল, এবং অংশত ভূমধ্যসাগরীয় শুষ্ক অঞ্চল ইউরোপিঅয়েডদের আবাসভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখান থেকেই ইউরোপিঅয়েডরা নানা দিকে বিস্তৃত হয়েছে এবং ক্রমে সমগ্র ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা তারা দখল করেছে। এ দেশান্তর গমন সম্ভবত ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগে অথবা পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল।

প্রত্নপ্রস্তর যুগের প্রথম পর্যায়ের শেষেই সম্ভবত নব্যমানবের উদ্ভব সম্পূর্ণ হয় এবং পূর্বোক্ত কিংবা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিয়ানডার্থালদের অবশিষ্টাংশের এ সঙ্গে মিশে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এর অনেক আগে। পরবর্তীকালীন নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে কখনও একই স্তরে নব্যমানবের চিহ্নাবশেষ লাভের কারণ ইহাই।

পূর্বোল্লিখিত তত্ত্ব ছাড়াও ইউরোপিঅয়েডদের বিস্তার সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ্য তত্ত্ব বর্তমান। কোন কোন লেখকের মতে অতি প্রাচীনকালে প্রটো-ইউরোপিঅয়েডদের একটি বর্গ পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশক্রমে একটি নৃবর্গের জন্মদান করে, যারা এশীয় মহাদেশের সমুদ্র উপকূলাঞ্চল, জাপান ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এ বর্গের প্রটো-ইউরোপিঅয়েড উদ্ভব সম্পর্কে সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এর বিকল্পস্বরূপ তাঁদের মতানুসারে অস্ট্রালয়েডদের সঙ্গেই কুরিল বর্গের অধিকতর ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা ব্যক্ত (৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পলিনেশীয়েরা ইউরোপিঅয়েডদের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন মতও ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয় এদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লক্ষ্যে (ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিয়ে হাওয়াই, সামোয়া, তাহিতি ও তোয়ামুতা দ্বীপপুঞ্জে) দীর্ঘযাত্রার শেষে নিউজিল্যান্ডের দুটি দ্বীপসহ সমগ্র পলিনেশিয়া দখল করে। সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা কিন্তু পলিনেশীয়দের মঙ্গোলয়েড-অস্ট্রালয়েড মিশ্র উদ্ভব এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী বর্গ হিসেবে এদের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন (৩৯—৪১ নং চিত্রাবলী)।

পলিনেশীয়দের 'শ্বেত জাতি' রূপে ঘোষণা করার প্রবণতা বহুলাংশে 'আর্য' জাতিতত্ত্বের অনুরূপ — যে মতবাদ অনুসারে উত্তর ইউরোপিঅয়েডরা প্রাচীন ভারত ও ইরান উদ্ভূত এবং মানবজাতির বিকাশে যাদের অগ্রগণ্য সামাজিক ভূমিকা স্বীকৃত। নিজেদের গড়নসদৃশ জাতিরূপের সন্ধানে এ তত্ত্বের কোন কোন সমর্থক নিজেদের কেবলমাত্র সাদা রঙ ইউরোপিঅয়েডদের মধ্যেই সীমিত রাখে নি, গাঢ়বর্ণের

৩৯ নং চিত্র: পলিনেশীয় পুরুষ
নিউজিল্যাণ্ড

৪০ নং চিত্র: সামোয়া-র পলিনেশীয়
তরুণ

৪১ নং চিত্র: সামোয়া-র পলিনেশীয় তরুণীগণ
(নিরক্ষীয় ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতির মধ্যবর্তী সংযোগী বর্গ)

ইউরোপিঅয়েড বর্গ এবং এমনকি পলিনেশীয়দের মতো অ-ইউরোপিঅয়েডদেরও মূল 'আর্য' রূপে স্বীকৃতি দিতেও তারা প্রস্তুত।

দক্ষিণ-পূর্ব অথবা পূর্বদিকে ইউরোপিঅয়েডদের দেশান্তর গমনের প্রাচীন প্রত্যয় পরিহার করে আমাদের নিকটবর্তী অঞ্চলের দিকে তাকানো উচিত, যাতে ইউরোপিঅয়েডদের বিকাশ সম্পর্কে একটি সাধারণ রূপরেখা এবং অন্য জাতিসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের একটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব হয়।

ইউরোপিঅয়েড ও নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড জাতির সম্পর্ক, তাদের পৃথক হওয়া ও স্বকীয়তা লাভ এবং এ সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সংযোগই প্রথমে ও সর্বাগ্রে বিবেচ্য প্রসঙ্গ। এই দুই মহাজাতি যে অতীতে একত্রীভূত ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিগ্রোয়েড বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত ফরাসী-ইতালীয় সীমান্তের মেণ্টনা (ফ্রান্স) শহরের কাছে ইনফ্যান্ট গুহায় (ইতালি) প্রাপ্ত ঊর্ধ্ব প্রস্তরপ্রস্তর যুগের দুটি কংকালই (গ্রিমাল্দি প্রকার, ১৯০৬ সালে প্রাপ্ত) এর সাক্ষ্য। পরবর্তীকালে এই মৌলবর্গ ইউরোপিঅয়েড ও নিগ্রোয়েড এই দুই মহাজাতিতে বিভক্ত হয়।

অতঃপর এই দুই মহাজাতি হাজার হাজার বছর ধরে বহু অঞ্চলে, বিস্তৃত মহাদেশে বিভিন্ন ভূচিত্রে ও জলবায়ুতে উষ্ণতা ও আর্দ্রতার বিবিধ তারতম্যে বিস্তার লাভ করেছে এবং এজন্যই পৃথক জাতি-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে বিকাশ লাভের ফলেই গাঢ়বর্ণের সুদানী নিগ্রো এবং হালকা বর্ণের উত্তর বা পূর্ব ইউরোপীয়রা পরস্পর থেকে পৃথক।

দুই মহাজাতির এই দুই প্রান্তিক জাতিবর্গের মধ্যবর্তী বহু পরিবর্তমান জাতিরূপের অস্তিত্ব রয়েছে যাদের নিগ্রোয়েড অথবা ইউরোপিঅয়েড হিসেবে সনাক্ত করা যথেষ্ট কষ্টকর। ইউরোপিঅয়েড অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের সমগ্র ভাগই এখন মাধ্যমিক জাতিরূপ-অধ্যুসিত।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ ভারতে ইউরোপিঅয়েড-নিগ্রোয়েড (অথবা নিগ্রোয়েড-ইউরোপিঅয়েড) মিশ্রজাতিরূপ অজস্র সংখ্যায় বর্তমান এবং নিগ্রো ও ইউরোপীয়দের মধ্যবর্তী সুস্পষ্ট পার্থক্যের ধারণা অপনোদনের পক্ষে এদের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট কার্যকরী। পূর্ব আফ্রিকীয় বা ইথিওপীয় বর্গ (৬ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত — যেখানে নিগ্রোয়েড ও ইউরোপিঅয়েড বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাপকভাবে পরস্পরমিশ্রিত যদিও নিগ্রোয়েড প্রবণতাই এ ক্ষেত্রে প্রকটতর (৪২-৪৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই দুই মহাজাতির দক্ষিণ-পশ্চিম শাখার আত্মীয়সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এখানে প্রদর্শিত।

৪২ নং চিত্র: ইথিওপিয়ার গালা উপজাতির পুরুষ
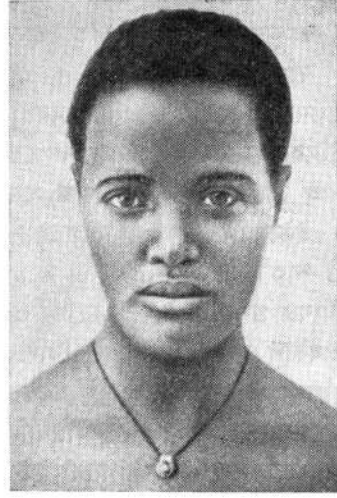
৪৩ নং চিত্র: ইথিওপিয়ার আমহার উপজাতির নারী

(নিরক্ষীয় ও ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির মধ্যবর্তী সংযোগী বর্গ)

ভারত ও শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলেও নিগ্রোয়েড-ইউরোপিঅয়েড জাতিরূপ সহজদৃষ্ট (৪৪ নং চিত্র)। এখানে দ্রাবিড় ও অনুরূপ নৃজাতিরূপের মধ্যে জাতিচরিত্রের যে যৌগ দেখা যায় তন্মধ্যে উল্লেখ্য : গাঢ় মধ্যম-বাদামী গাত্রবর্ণ, তরঙ্গিত পাতলা কেশ, মধ্যম পর্যায়ের গাত্ররোম, আংশিক ঢালু অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কপাল ও প্রকট ভ্রূরেখা, গভীরতর অক্ষিকোটর, স্বাভাবিক আকার অথবা প্রশস্ততর বাদামী চক্ষু, ভাঁজহীন ঊর্ধ্ব অক্ষিপুট, নীচু নাসাযোজক, সরল অথবা ঈষৎ উত্তল নাসা, প্রশস্ত নাসারন্ধ্র, স্বল্পপুরুষ্টু ওষ্ঠ, মৃদু অথবা মধ্যম চিবুকরেখা, যথেষ্ট খাটো মুখমণ্ডল, মধ্যম উত্থিত কিন্তু ঈষৎ অভিক্ষিপ্ত গণ্ডাস্থি (ঊর্ধ্ব চোয়াল ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত), উন্নত দীর্ঘ মস্তক (দীর্ঘমুণ্ড), অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর দেহ এবং দেহের স্বাভাবিক গড়নে স্পষ্ট মধ্যমাঙ্গিতা অথবা দীর্ঘাঙ্গিতা। জাতিচারিত্র্যের এ সংযোগ অনুসারে কোন কোন ভারতীয় বর্গ পূর্ব নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড জাতিরূপের এমনকি অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদেরও সমীপবর্তী।
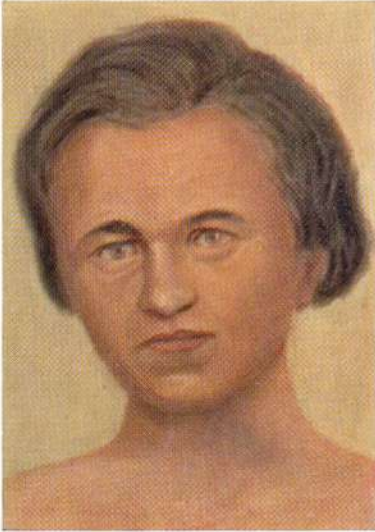
ল্যাপ বা সাম
(ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতির সংযোগী বর্গ)
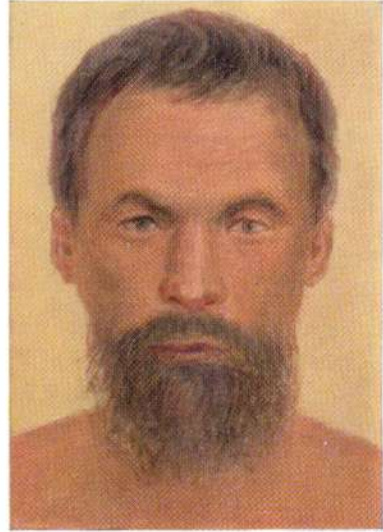
মারি
(ইউরোপিঅয়েড ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতির সংযোগী বর্গ)
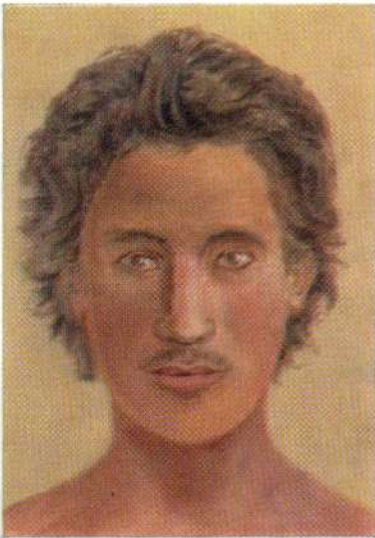
আরব
(ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির দক্ষিণ শাখা)
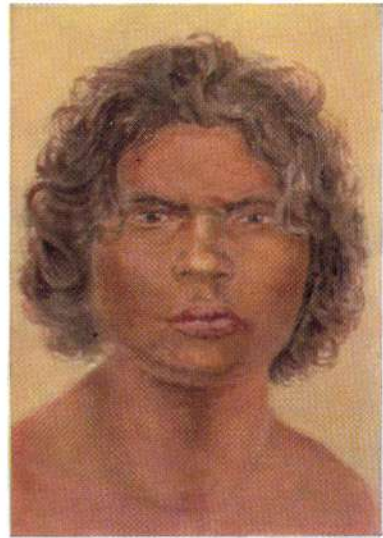
ভেদ্দা
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

ইথিওপীয় বা আবিসিনীয়
(ইউরোপিঅয়েড ও নিরক্ষীয় মহাজাতির
সংযোগী বর্গ)
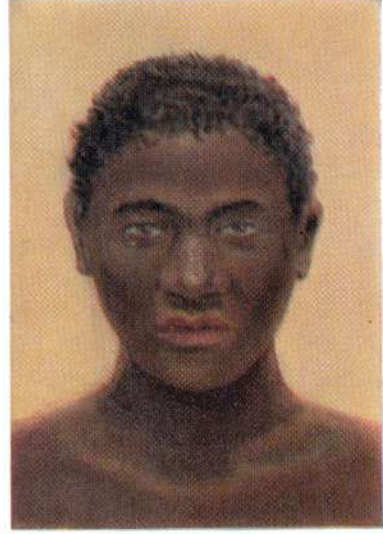
বাবিঙ্গা নেগ্রিলো
(নিরক্ষীয় মহাজাতির আফ্রিকান
শাখা)

বুশম্যান
(নিরক্ষীয় মহাজাতির আফ্রিকান
শাখা)
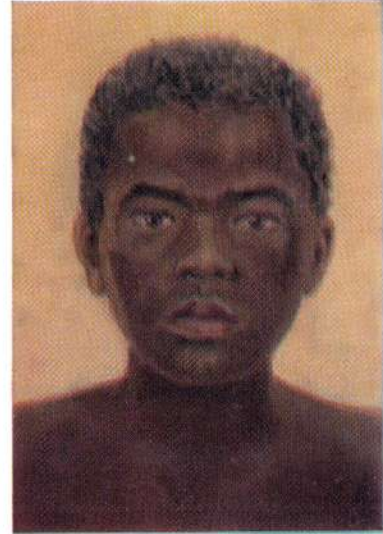
সেমাঙ্গ নেগ্রিটো
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয়
শাখা)

জাতিচারিত্র্যের এ যৌগ ইউরোপিঅয়েড ও নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড মহাজাতিসমূহের অন্তর্গত জাতিবর্গসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাক্ষ্য। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে যদিও এ সব জাতি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের নিয়মে এমন সুচিহ্নিত কিন্তু তারা এখনো সর্বত্র সম্পূর্ণ পৃথকীভূত নয়। অধিকন্তু জাতিমিশ্রণের ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার ফলে মানবজাতির মধ্যে এ ধরনের মিশ্রচারিত্র্য-যৌগের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করছে।

৪৪ নং চিত্র: শ্রীলঙ্কার সিংহলী নারী (নিরক্ষীয় ও ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির মধ্যবর্তী সংযোগী বর্গ)

হাজার হাজার বছর টিকে থাকার ফলে ইউরোপিঅয়েড মহাজাতি আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বিভিন্নতা লাভ করেছে যার মুখ্য কারণ জলবায়ুর মতো প্রাকৃতিক শর্ত এবং বিশেষভাবে সামাজিক হেতুসমূহ (জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দেশান্তরণ, উপজাতি ও বর্গের মিশ্রণ ইত্যাদি)। এভাবেই ক্ষুদ্র বা অধিজাতিসমূহ অবয়ব লাভ করেছে এবং পৃথক নৃবর্ণের উদ্ভব ঘটেছে। বিভেদন ও অধিজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক মিশ্রণ প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকে যা জাতির উদ্ভব অবদমনের পক্ষে আদর্শ এবং যে প্রকরণ বিরতিহীন। নৃবর্ণের পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে বিভেদন-প্রকরণ সঙ্গতি হারায়, শ্লথ হয়, ফলত ইউরোপিঅয়েড অধিজাতিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তঃমিশ্রণ অব্যাহত থাকে।

ইউরোপিঅয়েডদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরাঞ্চলীয়েরাই প্রথম স্বরূপ প্রাপ্ত অধিজাতি, যারা নব্যমানবের আদি-আবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই পরিবেশে মানুষের পক্ষে কেবলমাত্র গাঢ়বর্ণের গাত্র, চক্ষু ও কেশই স্বাভাবিক, যা দক্ষিণী ইউরোপিঅয়েডদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য (যথা আরবগণ, ৫ নং প্লেট দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণ ইউরোপ ও মধ্য ইউরোপের একাংশ, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়ার সম্মুখভাগ, ককেশাস, মধ্য এশিয়া ও ভারতের উত্তরাঞ্চল সহ বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহুদূর অবধি এরা বিস্তৃত।

৪৫ নং চিত্র: গ্রিমাল্দি শ্রেণীর তরুণের মুণ্ড (নিগ্রো বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত), মেণ্টনার নিকটে এন্‌ফ্যাণ্ট্‌স্ গুহায় প্রাপ্ত (১৯০৬)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ অঞ্চল গ্রিমাল্দি (৪৫ নং চিত্র), ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ ও কোম্ব-ক্যাপেলে (অরিগ্‌নাগ মানব) জাতীয় আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানব-অধ্যুসিত ছিল। সম্ভবত ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌দের উদ্ভব ঘটেছিল গ্রিমাল্দি (নিগ্রোয়েড) ও অরিগ্‌নাগদের পরবর্তীকালে। উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের ইউরোপিঅয়েডদের কংকাল-সমূহ ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌দেরই সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়াস্থ মুর্জাক-কোবা গুহায় এবং ভরোনেঝের নিকটস্থ কোস্তিওন্‌কি গ্রামে প্রাপ্ত দুটি ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ সদৃশ কংকালের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে আমাদের পক্ষে নব্য ইউরোপিঅয়েডদের, মূলত ভূমধ্যাঞ্চলীয়দের প্রত্ন-প্রস্তর যুগীয় পূর্বপুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ সম্ভব, কিন্তু এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে ইউরোপিঅয়েড ক্ষুদ্রজাতিসমূহের সন্ধান এখনো দুঃসাধ্য। বিশেষজ্ঞেরা নব্যপ্রস্তর যুগীয় কংকালে ইউরোপিঅয়েড ক্ষুদ্র-জাতিসমূহের সুস্পষ্ট লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন, এমনকি এ থেকে কোন কোন নৃজাতিবর্গকে, বিশেষভাবে মুণ্ডের ব্যাপক প্রস্থীয় বৃদ্ধিজনিত গোলাকার আকৃতির (হ্রস্বমুণ্ডীভবন) মুণ্ডের বৈশিষ্ট্যে সনাক্ত করেছেন।

নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি থেকে মনে হয় পূর্বপুরুষদের বিলম্বে উপস্থিতির জন্য উত্তর ইউরোপিঅয়েড জাতি পরবর্তীকালে স্বকীয়তা লাভ করে কারণ হিমবাহ যুগের সেকালে এ অঞ্চল ছিল তুষারাবৃত। কিন্তু এ সময়ে দক্ষিণাঞ্চল তুষারমুক্ত ছিল তাই উত্তর ইউরোপে পৌঁছানোর বহু সহস্র বৎসর আগে এখানে মানুষের পক্ষে বসবাস ও বিকাশ লাভ সম্ভবপর হয়েছে।

বিশ বা ত্রিশ হাজার বছর দীর্ঘ যে কালের পরিসরে ইউরোপিঅয়েডরা উত্তরাঞ্চলে

দেশান্তরিত হয়েছে ততদিনে তাদের মধ্যে দৃষ্ট দৈহিক পার্থক্যের উন্মেষ ঘটেছে। তন্মধ্যে চর্ম, চক্ষু ও কেশের বর্ণকণিকার বিলয় বা বর্ণহীনতা সম্ভবত সর্বাধিক উল্লেখ্য যা বর্তমানে উত্তর ইউরোপিঅয়েডদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই পরিবর্তনের কারণসমূহ তেমন সুস্পষ্ট নয়, সম্ভবত তাপমাত্রা ও শীতার্ত আবহ-অঞ্চলের নতুন অবস্থার সঙ্গে এ সম্পর্কিত।

প্রসঙ্গত আমাদের পক্ষে এ অনুবিধি স্বীকার্য যে, উত্তর ইউরোপিঅয়েড বা বল্টিক জাতির উদ্ভব যেহেতু অপেক্ষাকৃত ইদানিংকালে তাই জাতি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাদের চারিত্র্যসমূহ দক্ষিণ ইউরোপিঅয়েড জাতির মতো সুচিহ্নিত নয়। পৃথকভাবে উদ্ভূত শীতার্ত ও অধিকতর আর্দ্র আবহাওয়ার প্রভাবে বর্ণহীনতা প্রাপ্ত নৃজাতিবর্গ রূপেই এদের গণ্য করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপিঅয়েড ক্ষুদ্রজাতির মধ্যে বিবিধ প্রকার বর্ণিল, রূপান্তরশীল বহু নৃবর্ণের অস্তিত্বও বর্তমান। দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলীয় ক্ষুদ্রজাতিসমূহ অধ্যুসিত অঞ্চলের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই এদের আবাসস্থল (ন. ন. চেবোক্-সারভ)।

৭। নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড মহাজাতি

উষ্ণমণ্ডলে বসবাসকারী অধিকাংশ নৃজাতিবর্গসমূহই নিরক্ষীয় বা নিগ্রো-অস্ট্রালয়েড মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে এরা আফ্রিকান বা নিগ্রোয়েড এবং মহাসাগরীয় বা অস্ট্রালয়েড এই দুই সহজ-সনাক্তীযোগ্য জাতিতে বিভক্ত (৪৬ নং চিত্র)।

আমরা যদি আফ্রিকানদের সঙ্গে অস্ট্রালয়েড গণবর্গের তুলনা করি তবে তাদের বিস্ময়কর সাদৃশ্যের সঙ্গে বিবিধ পার্থক্যও আমাদের চোখে পড়বে। প্রথমত নিগ্রোয়েডদের দেহরোম অত্যল্প, বহু ক্ষেত্রে বস্তুত অনুপস্থিত অথচ অস্ট্রেলীয় আদিবাসী, মেলানেশীয়, পাপুয়ানদের ক্ষেত্রে এর প্রাচুর্য সহজলক্ষ্য। নিগ্রোদের কেশ পাপুয়ান বা মেলানেশীয়দের তুলনায় অধিকতর নিবিড়ভাবে কুঞ্চিত এবং এই শেষোক্তদের শিশুরা তরঙ্গিত কেশ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে যা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে কুঞ্চিত হয়। সাবালক এবং শিশু অস্ট্রেলীয় উভয়ের কেশই তরঙ্গিত।
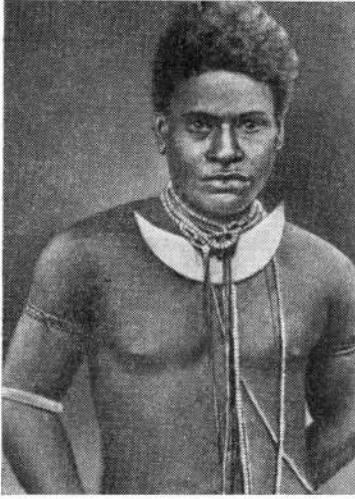
৪৬ নং চিত্র: সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মেলানেশীয় পুরুষ
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

আফ্রিকানদের কপাল খাড়া এবং ললাটাংশ সুগঠিত, ইন্দোনেশীয় অস্ট্রাল-য়েডদের কপাল মাঝারি রকমের ঢালু, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট ঢালু এবং এ শেষোক্তদের ভ্রূরেখা সাধারণত প্রকট, কিন্তু আফ্রিকান নিগ্রোদের ভ্রূরেখা প্রায় অদৃশ্য। কপালের গড়নের দিক থেকে আফ্রিকানরা মহাসাগরীয় অস্ট্রালয়েডদের তুলনায় তাদের পূর্বপুরুষ থেকে অধিকতর দূরবর্তী। কিন্তু নাসার গড়নের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা বর্তমান। যথানিয়মে আফ্রিকান নিগ্রোয়েডদের নাসা চ্যাপ্টা, কিন্তু প্রাচ্য নিগ্রোয়েডদের নাসা উন্নত অথবা উত্তল, যদিও কোন কোন মেলানেশীয়দের ক্ষেত্রে তা অবতলাকৃতি।

সুতরাং কেশ, কপালের গড়ন, ভ্রূরেখা এবং নাসার গড়নের মধ্যেই নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েডদের পার্থক্যের মূল বৈশিষ্ট্য নিহিত। তাদের অজস্র সাদৃশ্যের মধ্যে এ বৈষম্য তেমন প্রকট নয়। পরস্পর থেকে বহুদূর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পৃথক পরিবেশে নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েড অধিজাতির ক্রমবিকাশের স্বতন্ত্র ধারাই সম্ভবত এর গ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের শুরুতে অস্ট্রালয়েড নিগ্রোয়েড মূল জাতিরূপ দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোচীন, ভারত অথবা আরো দূর পশ্চিমে কোথায়ও বসবাস করত এবং পরে তারা পশ্চিমী ও প্রাচ্য বর্গে বিভক্ত হয়, ক্রমে তাদের পরস্পর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এমন সম্ভাবনা বিশ্বাস্য মনে হয়।

প্রায় ৫০,০০০ বছর বা তারও আগে যদি এরূপ আদি নিরক্ষীয় জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে তাদের স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত জাতিবর্গের পরবর্তী বিসরণ পন্থা অতঃপর অনুমান করা সহজ। প্রথমে তারা দক্ষিণ-পূর্ব বা মহাসাগরীয় এবং পশ্চিমী এই দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়, অতঃপর আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং আরো পরে তারা আফ্রিকায় পৌঁছয়।

দেশান্তর গমন এবং সুস্থিত জাতিসত্তার পরিবর্তন ও বিভেদন প্রকরণে নতুন জাতিবর্গের উদ্ভব পরস্পর সম্পর্কিত। নিগ্রোয়েডদের মধ্যে কেশের তরঙ্গিত ঘন-বদ্ধতা সর্পিল কুণ্ডনে রূপান্তরিত হল, শুরু হল দেহরোমের অপসরণ; খাড়া হল কপাল, খর্বিত হল ভ্রূরেখা এবং এদের প্রতিনিধি বিশেষে নাসা হল উন্নত। এ প্রকরণের আত্যন্তিক জটিলতা সহজবোধ্য এবং পর্যাপ্ত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর অভাবে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখনো আমাদের সাধ্যাতীত।

আমরা আবার বলছি যে নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েডদের পশ্চিমী (আফ্রিকান) ও প্রাচ্য (মহাসাগরীয়) বর্গের মধ্যবর্তী জাতি চারিত্র্যের সাদৃশ্য তাদের আত্মীয়তা ও অভিন্ন-উদ্ভবের সাক্ষ্য।

অস্ট্রালয়েড বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আফ্রিকান নিগ্রোয়েডদের স্বয়ম্ভু বিকাশ সম্পর্কে সাধারণত দুটি যুক্তি প্রচলিত।

প্রথমত নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েড অধ্যুসিত অঞ্চলসমূহের মধ্যবর্তী বিপুল দূরত্ব। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যখনই পূর্ব আফ্রিকাবাসী ইথিওপীয় এবং ভারতবাসী দ্রাবিড় ও ভেদ্দাদের (৪৭ নং চিত্র এবং ৫ নং প্লেট) কথা মনে হয় — যে দুই বর্গ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ তখনই এ তথ্য বহুলাংশে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। গাঢ়বর্ণের পরস্পর ঘনিষ্ঠ এ দুই নরবর্গ — নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েডদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বংশজনিত পার্থক্যের সাক্ষ্য রূপে চিহ্নিত করা যায় না।

আফ্রিকান নিগ্রোয়েডদের স্বয়ম্ভু বিকাশ সম্পর্কে দ্বিতীয় যুক্তির ভিত্তি প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক তথ্যাবলী। এ মতানুসারে আফ্রিকা মহাদেশে প্রাপ্ত শিলীভূত মানবের অস্থি-অবশেষে অত্যধিক প্রাচীনত্ব ও আদিমতা আরোপিত এবং এতে নিগ্রোয়েড বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত।

অপেক্ষাকৃত ইদানিংকালে প্রাচীন নিগ্রোয়েড মানবের অস্থি-অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহারা মরুর গভীরে অবস্থিত আসেলার* সামরিক ফাঁড়িতে প্লিস্টোসিন স্তরে প্রায় সম্পূর্ণ একটি প্রস্তরীভূত নিগ্রোয়েড মানবের কংকাল পাওয়া যায় (৪৮ নং চিত্র)। যা হোক এ কংকাল ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষপর্যায়কালীন (ম্যাগডালেনিয়ান)। কংকাল থেকে দেখা যায় যে আসেলার মানবের দৈহিক উচ্চতা ১৭০ সেন্টিমিটারের কম ছিল না। তার করোটির ধারণক্ষমতা ১৫০০ সিঃ সিঃ এবং মুণ্ডাংক ৭০·৯ (দীর্ঘকরোটিক)।

---

* টিম্বাকটু-এর চারশ' কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ও আল-মাব্রুক-এর দুশ' কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে।
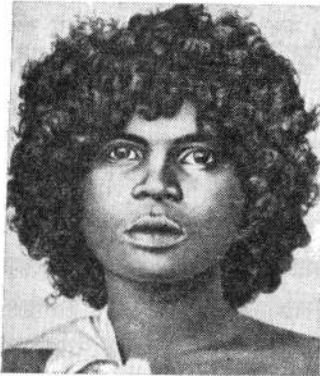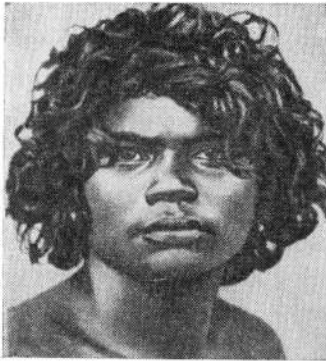
৪৭ নং চিত্র: ভেদ্দা — পুরুষ (উপরে) ও নারী (নীচে)
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

১৯৩৯ সালে পূর্ব আফ্রিকার নাইওয়াশা-র কাছে একটি কৌতূহলোদ্দীপক নিগ্রোয়েড মুণ্ড আবিষ্কৃত হয়। নিগ্রো জাতির বিকাশের কোন পর্যায় সনাক্ত করার মতো প্রাচীনত্ব এর ছিল না। নব্য আফ্রিকানদের সদৃশ জাতিবৈশিষ্ট্য এতে চিহ্নিত ছিল।

বহু-কেন্দ্রিক উদ্ভব মতবাদের অনুসারীরা রোডেসিয়ার ব্রোকেন হিল (৪৯ নং চিত্র) এবং পূর্ব আফ্রিকার নিয়ারাসা (ইয়াস্‌সি) হ্রদে প্রাপ্ত দুটি আদিমতর এবং সম্ভবত প্রাচীনতর মুণ্ডের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন। এর প্রথমটি পাওয়া
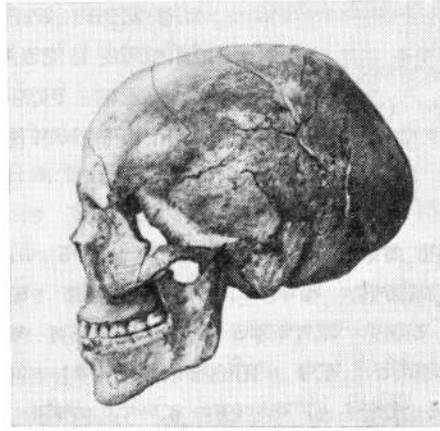
৪৮ নং চিত্র: সাহারার আসেলার-এ প্রাপ্ত নিগ্রোয়েড ধরনের মুণ্ড (১৯২৭)

যায় ১৯২১ সালে; নিগ্রোয়েড মুণ্ডের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই এবং তা আলোচনাযোগ্যও নয়; তাছাড়া এর ভূতাত্ত্বিক কালক্রমও অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। এই মুণ্ড নিয়ানডার্থাল সদৃশ। এর অক্ষিগোলকের উপরস্থ ভ্রূশিরা উৎক্ষীপ্ত, কপাল তীক্ষ্ণভাবে ঢালু এবং বহিঃস্থ উচ্চাবচ প্রকট। নব্যমানবের মতো এর মহাবিবর মুণ্ডের গোড়ার মধ্যভাগে প্রায় আনুভৌমিকভাবে স্থাপিত। এর করোটির ধারণক্ষমতা প্রায় ১২০০ সিঃ সিঃ। যে জংঘাস্থি (টিবিয়া) এরই বলে মনে করা হয় তার পরিমাপে ব্রোকেন হিল মানবের উচ্চতা প্রায় ১৮০ সেণ্টিমিটার। ব্রোকেন হিল
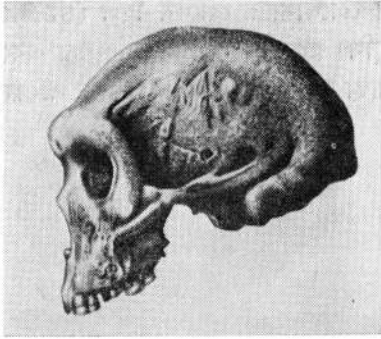
৪৯ নং চিত্র : উত্তর রোডেসিয়ার ব্রোকেন হিল মানবের মুণ্ড (১৯২১)

ভগ্নাবশেষ দেখে মনে হয় যে, হোমিনিডদের কোন আদিমতর বর্গ সম্ভবত এশিয়া থেকে আফ্রিকায় প্রবেশ করে কিন্তু পরবর্তীকালে আর বিবর্তিত হয় নি এবং সন্ততিহীন অবস্থায় বিলুপ্ত হয়।

পূর্ব আফ্রিকার নিয়ারাসা (ইয়াস্‌সি) হ্রদের তীরে ১৯৩৫ সালে প্রাপ্ত মুণ্ডের ভগ্নাবশেষ কোন নিগ্রো বৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত নয়।

সুতরাং নিগ্রোয়েড বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন নিয়ানডার্থাল মুণ্ড আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয় নি।

ওল্দোভাই ও গেম্বল্‌-এ (পূর্ব আফ্রিকা) প্রাপ্ত আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের নিগ্রোয়েড মুণ্ড এশিয়া থেকে প্রটো-নিগ্রোয়েডদের অনুপ্রবেশের সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে। এই আদি নিগ্রোয়েডরা তাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মুখমণ্ডল দ্বারা চিহ্নিত এবং ইথিওপীয় নৃজাতিবর্গের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ। এদের প্রাপ্তিস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মনে হয় দক্ষিণ এশীয় আদি নিগ্রোয়েড জাতি আরব থেকে সোমালিল্যাণ্ড হয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় পেঁছয়। শুকবা গুহা ও কার্মাল পাহাড়ে প্রাপ্ত কয়েক ডজন কংকাল থেকে দক্ষিণ এশীয় নিগ্রোয়েডদের পশ্চিমমুখী দেশান্তর গমনের আরো একটি সম্ভাব্য পথরেখার সন্ধান মেলে। এসব লোকেরা ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগের (বা মধ্যপ্রস্তর যুগের) অধিবাসী।

আসেলার-কংকাল গঠন-বৈশিষ্ট্যে প্রাচ্য ও পশ্চিমী নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েডদের আত্মীয় সম্পর্কের সাক্ষ্যবিশেষ। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, অন্তর্বর্তী এশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি বিস্তৃত এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েড জাতিচারিত্র্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি জালিকাবৎ পরস্পরসংবদ্ধ। কখনো কখনো তেমন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত না হলেও এক্ষেত্রে এমন সব নির্দিষ্ট চিহ্নাদি বর্তমান যা আফ্রিকান ও মহাসাগরীয় জাতিসমূহের অর্থাৎ নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড আত্মীয়তা সপ্রমাণ করে।

এদের সংস্থিতির মধ্যে পিগমিদের অবস্থিতি নিরক্ষীয় জাতির অন্যতম নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। ইউরোপিঅয়েড বা মঙ্গোলয়েড এই উভয় জাতির ক্ষেত্রেই এ ধরনের খর্বকায় নৃবর্ণ অনুপস্থিত। আফ্রিকান ও মহাসাগরীয় পিগমিরা যথাক্রমে নেগ্রিলো ও নেগ্রিটো নামে পরিচিত (উভয়ই 'নিগ্রো' শব্দের সঙ্গে ক্ষুদ্রতাব্যঞ্জক প্রত্যয়যোগে উদ্ভূত)।

জাতিসমূহের উদ্ভব ও নৃজনন সম্পর্কিত নিরীক্ষার জন্য পিগমিদের উৎপত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পিগমিদের উৎপত্তির প্রশ্নে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে যে মতানৈক্য বিদ্যমান তা বহুকালের পুরানো। প্রতিক্রিয়াশীল নৃতাত্ত্বিকদের মতে পিগমিরা অতি আদিম, 'হীনদের মধ্যে হীনতম', প্রায় বনমানুষ পর্যায়ের এবং নিঃশেষ অবলুপ্তিই এদের ভবিতব্য।

সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিশেষ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন এবং এর অবৈজ্ঞানিক চারিত্র্য ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করেছেন। পশ্চিমী ও প্রাচ্য এই উভয় পিগমিবর্গই পর্যাপ্ত জীবনীশক্তিতে উদ্দীপ্ত, যেকোন প্রকার অবক্ষয়ের লক্ষণমুক্ত, এবং জৈবিক গুণে যেকোন নৃজাতিবর্গের সমকক্ষ। তারা দ্রুত ও পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতেও সক্ষম।

অন্যান্য দেশের কিছুসংখ্যক পন্ডিতবর্গের মতে পিগমিরা সমগ্র মানবজাতির পূর্বপুরুষ, কিন্তু সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা এ প্রত্যয়েরও বিরোধী। বস্তুত আদিতম মানুষ পিগমি অপেক্ষা দীর্ঘদেহী ছিল (সিনানথ্রপাস ছিল ১৫২-১৬৩ সেঃ মিঃ এবং পিথেকানথ্রপাস ১৬৫-১৭০ সেঃ মিঃ)। নিয়ানডার্থালিরাও পিগমি অপেক্ষা দীর্ঘদেহী ছিল এবং তাদের উচ্চতা ছিল ১৫৫-১৬০ সেঃ মিঃ। সুতরাং পিগমিরা মানব বিবর্তনের প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের নিদর্শন নয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই নরবর্গের দৈহিক ক্ষুদ্রত্ব অপ্রধান বৈশিষ্ট্য, উহা আংশিক ও স্থানীয়, কারণ মানুষের একটিমাত্র মহাজাতিতেই এর অস্তিত্ব আছে এবং অন্যত্র তা অনুপস্থিত। ভাষান্তরে দীর্ঘদেহী মানুষের মতো পিগমিরাও মধ্যম উচ্চতাবিশিষ্ট যথোপযুক্ত নৃবর্ণের কোন প্রতিনিধি থেকে উদ্ভূত।

অতঃপর আমরা নেগ্রিলোদের* বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করব। স্মর্তব্য যে, মধ্য

---

* নিরক্ষীয় আফ্রিকার কেন্দ্রাঞ্চলের ঘন বনে নেগ্রিলোদের আবাস। ইটুরি অঞ্চল পূর্বী নেগ্রিলো (বাম্বুটি), কঙ্গো অঞ্চল কেন্দ্রীয় বর্গ (বাটুয়া) এবং প্রাক্তন ফরাসী নিরক্ষীয় আফ্রিকার অংশবিশেষ এবং কেমেরুন পশ্চিমী বর্গ (বাবিঙ্গা) অধ্যুসিত।

আফ্রিকান বা পিগমি নৃজাতিবর্গসমূহ এ নামের অন্তর্ভুক্ত (৫৮) (৬ নং প্লেট দ্রষ্টব্য)।

একজন নেগ্রিলোর উচ্চতার গড় ১৫০ সেঃ মিঃ, এর বেশি নয়। এদের কোন কোন উপজাতির সাবালক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উচ্চতা যথাক্রমে সর্বনিম্ন ১৪০ এবং ১৩০ এমনকি ১২৫ সেঃ মিঃ হতে পারে। এদের পুরুষমাত্রেই শ্মশ্রুল নয়; কোন কোন উপজাতির মধ্যে গাত্ররোম অত্যল্প, অন্যত্র মধ্যম। এদের মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও মধ্যমুন্ডীয়; মুখমন্ডল খাটো কিন্তু অক্ষিগোলক গোলাকার ও উঁচু; চক্ষু বাদামীবর্ণ, ওষ্ঠ মধ্যমপুরুষ্টু বা পাতলা; নাসা প্রশস্ত, যোজক নীচু অথবা মধ্যম; খাটো পায়ের তুলনায় এদের দেহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর; বাহু-কংকাল সরু অস্থি (ক্ষীণ ও দীর্ঘ) দ্বারা গঠিত। সাধারণ সাদৃশ্যে নেগ্রিলোরা তাদের প্রতিবেশী নিগ্রোয়েডদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; তাদের দেহ সাধারণত গাঢ়বর্ণের, চুল সর্পিলাকারে কুঞ্চিত, নাসা অত্যন্ত প্রশস্ত এবং কপাল উত্তল।

এখন নিউগিনি, নিউহেব্রাইডিস এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জবাসী নেগ্রিটোদের নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

নিউগিনির এক নেগ্রিটোবর্গ সাদৃশ্যের দিক থেকে মেলানেশীয়দের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিউ ক্যালেডোনিয়াবাসীদের কথা উল্লেখ্য। এদের উচ্চতা ১৫০-১৫২ সেঃ মিঃ। এদের অন্যবর্গ পাপুয়ানদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু এদের নাসা প্রশস্ততর; তা ছাড়া এরা মধ্যমুন্ড কিন্তু পাপুয়ানরা দীর্ঘমুন্ড। এই নেগ্রিটোরা খর্বকায়, পুরুষদের সর্বাল্প উচ্চতা ১৪৪ সেঃ মিঃ। এরা পাপুয়ান বর্গের একটি ভেদ রূপে চিহ্নিতব্য।

এতদ্ব্যতীত মহাসাগরীয় নৃবর্ণের আরো বহু বর্গ আছে যারা নিউগিনির নেগ্রিটো সদৃশ; যথা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জবাসী, ফিলিপাইনের লুসনবাসী আয়েতা, এবং মালাক্কা উপদ্বীপের সেমাঙ্গ (৬ নং প্লেট দ্রষ্টব্য)। কোন কোন নৃতাত্ত্বিকের মতে এ সকল নেগ্রিটোরা একই নৃবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। তৎসত্ত্বেও এ সকল বর্ণই পৃথক উৎস উদ্ভূত এবং তাদের আবাস পরস্পর দূর দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন। সেজন্য তাদের এক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। ইন্দোচীনের সেনোয়াগণ, যাদের দৈহিক উচ্চতার গড় ১৫৪ সেঃ মিঃ, পিগমিদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তারা যে জাতিবৈশিষ্ট্যে ভেদ্দাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এ তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন; এদের নাসা প্রশস্ত, দেহবর্ণ হলুদ-বাদামী, কখনো গাঢ়-বাদামী এবং কেশ দীর্ঘ ও তরঙ্গিত।

পাপুয়ান ও মেলানেশীয় বর্গের কোন নৃবর্ণ থেকে নিউগিনির নেগ্রিটোগণ উদ্ভূত হয়েছে এ প্রত্যয় বহুলাংশে তথ্যনির্ভর। অন্তত একটি তথ্য থেকে এর
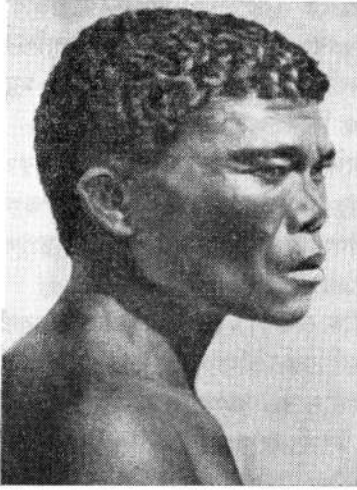
৫০ নং চিত্র: কালাহারি মরুভূমির বুশম্যান — তরুণ (বামে) বয়স্ক পুরুষ (ডাইনে)
(নিরক্ষীয় মহাজাতির আফ্রিকান শাখা)

সমর্থন মেলে; নিউগিনির টাপিরো পিগমিরা এ দ্বীপের উত্তরাঞ্চলীয় আরুপ উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যাদের উচ্চতার গড় ১৬০ সেঃ মিঃ। বর্গ থেকে বর্গান্তরে ক্রমরূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথ এবং সহজলক্ষ্য নয়। খর্বকায় অন্যান্য উপজাতিরাও সম্ভবত প্রতিবেশী উপজাতি উদ্ভূত বা এমন কোন বর্গাবিশেষের পরিব্যাপ্তির ফল যারা একদা অতীতে ইন্দোচীন অথবা দক্ষিণ চীন থেকে পার্শ্ববর্তী মালয় দ্বীপপুঞ্জ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে ক্রমান্বয়ে যাত্রাবিরতি ও শেষে স্থায়ীভাবে অবস্থানক্রমে পর্বত ও অরণ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

নেগ্রিলো ও নেগ্রিটোদের আবাসভূমি অন্যূন ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে পরস্পরবিচ্ছিন্ন। যদি এদের মধ্যবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার কোন অঞ্চলে কল্পিত খর্বকায় কোন জাতি থেকেই তাদের উদ্ভব ঘটে তবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাদের প্রসারের ব্যাখ্যা কি? কিভাবে প্রটো-পিগমিরা দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে? এ ধরনের ধারণা বাস্তব তথ্যানুগ নয়, কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় খর্বকায় মানুষের কোন ফসিলাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নি।

আফ্রিকার বুশম্যানরা খর্বকায় এবং পিগমিদের ঘনিষ্ঠ (৫০ নং চিত্র)। এরা দক্ষিণ আফ্রিকান বা বুশম্যান নৃবর্গের অংশবিশেষ।

এই খর্বকায় জাতি (উচ্চতার গড় ১৫২-১৫৫ সেঃ মিঃ) এখন লুপ্তপ্রায়। কালাহারির সাভানা অঞ্চলের প্রত্যন্ত অংশে এবং আরো পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী পীত নদী ও কুনিন নদীর মধ্যবর্তী নামিব মরুতে মাত্র কয়েক সহস্র বুশম্যান সংরক্ষিত অবস্থায় আজও টিকে আছে।

খর্বদেহ ছাড়াও বুশম্যানরা বিবিধ পিগমি-চারিত্র্যের অধিকারী; যথা অপেক্ষাকৃত খাটো পা (দেহের সঙ্গে তুলনায়), বৃহদাকার মস্তক, চ্যাপ্টা ও অত্যন্ত খাটো মুখমণ্ডল, উন্নত খাটো কপাল, অনুচ্চ ভ্রূরেখা, প্রক্ষিপ্ত গণ্ডাস্থি, নীচু যোজক ও প্রশস্তপক্ষ নাসা এবং স্বল্পোন্নত চিবুক (৬ নং প্লেট দ্রষ্টব্য)।

বুশম্যানদের অন্যান্য স্বকীয় চারিত্র্য: হলদে দেহবর্ণ (স্ত্রীলোকদের দেহবর্ণ পুরুষদের অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হালকা), মুখচর্ম কুণ্ডনচিহ্নিত, কেশ কালো এবং আফ্রিকান নিগ্রোদের অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে কুঞ্চিত, মুখ ও দেহের রোম প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, চক্ষু বাদামীবর্ণ, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় অক্ষিপুটেই প্রকট ভাঁজযুক্ত কিন্তু অক্ষিকোণঝুটি সাধারণত অনুপস্থিত, ওষ্ঠ পুরুষ্টু ও উপরোষ্ঠ প্রবর্ধিত, কর্ণলতি মস্তকচর্মে বদ্ধ এবং মুক্ত নয়।

গাত্রবর্ণ, অক্ষিপুটের ভাঁজ এবং আংশিক প্রশস্ত মুখমণ্ডলের জন্য বুশম্যানরা অনেকাংশে মঙ্গোলয়েডদের সদৃশ কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ নয়। বুশম্যানদের অক্ষিপুট-ভাঁজের গড়ন মঙ্গোলয়েডদের থেকে আলাদা। এসব সাদৃশ্য বাহ্যিক এবং সন্দেহাতীতভাবে মরু অঞ্চলের সদৃশ পরিবেশে বসবাসজনিত একই অবস্থার ফল।

অধিকাংশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যানুসারে বুশম্যানরা সুদানী নৃবর্গের (বা মূল নিগ্রো) সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এদের খর্বাকৃতি ও হালকা বর্ণ সম্ভবত পরিবৃতির ফল। নিতম্বে সঞ্চিত চর্বি-কলা (নিতম্বস্ফীতি) এদের নিগ্রো-উদ্ভব প্রত্যয়ের বিরোধী নয়, কারণ এ বৈশিষ্ট্য অন্যান্য আফ্রিকান নৃবর্গের মধ্যেও বর্তমান, যথা সোমালি উপদ্বীপের উপজাতিরা। নিতম্বস্ফীতি বুশম্যানদের প্রতিবেশী হটেনটটদের মধ্যে সর্বাধিক প্রকট।

প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি বুশম্যান ও নিগ্রোদের সম্পর্ক নির্ণয়ে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পরিপূরক। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকার কোন কোন অংশে প্রাচীনকালে অঙ্কিত আদিম পশু ও মানুষের যে চিত্রাঙ্কন ও খোদাইসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে তা বুশম্যানদের চিত্রাঙ্কনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে একদা বুশম্যানরা আফ্রিকায় বহুব্যাপ্ত ছিল এবং সম্ভবত এরা এ মহাদেশের আদিমতম জনগোষ্ঠীর অন্যতম।

প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদিও বুশম্যান ও নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাস্তবতা সপ্রমাণ করে। ফ্লেট্স্ অন্তরীপে (কেপটাউনের নিকটে) আবিষ্কৃত ও ১৯২৯ সালে বর্ণিত নরমুণ্ড দীর্ঘকরোটিক, এর কপাল ঢালু, ভ্রূশিরা প্রকট, নাসা প্রশস্ত এবং এর অধিকারীর দেহদৈর্ঘ্য ১৬৮ সেঃ মিঃ নির্ণীত।

অতএব বুশম্যান নৃবর্গ সন্দেহাতীতভাবে আফ্রিকান নিগ্রোয়েড জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদের অবস্থান কিছুটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এ থেকে সেই সত্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় যে বাহ্যিক চারিত্র্যে জাতিজনির সম্পর্ক সর্বত্র নির্ণীতব্য নয়।

যে নৃবর্গসমূহ দ্বারা অস্ট্রালয়েড জাতি গঠিত এবং যেখানে অস্ট্রেলীয় বর্গই সর্বাধিক স্বকীয় তাদের পরীক্ষার সময় এ প্রসঙ্গ সবিশেষ স্মরণীয়। অতি দীর্ঘ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, অপেক্ষাকৃত সীমিত আয়তন মহাদেশ, প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের অভাব এবং এশীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূর অবস্থান ইত্যাকার শর্তবেষ্টনীতেই অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের বিকাশ।

সামগ্রিকভাবে অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের জাতিচারিত্র্য নিগ্রোয়েড আকৃতির ঘনিষ্ঠ, যদিও তরঙ্গিত কেশ, সুগঠিত মুখমণ্ডল, দেহরোমের প্রাচুর্য এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্য থেকে এদের সঙ্গে ইউরোপিঅয়েডদের দূর সম্পর্কের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। ইউরোপিঅয়েডদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই এ সব বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে এ ক্ষেত্রে এমন ধারণাই অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ; এ ধরনের সমান্তরাল সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ এক্ষেত্রে আইনুদের (কুরিল দ্বীপবাসী) ঘনবদ্ধ দেহরোমের কথা উল্লেখ্য।

অস্ট্রেলীয়রা (৫১ নং চিত্র) অস্ট্রালয়েড বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোন কোন মেলানেশীয় (৭ নং প্লেট দ্রষ্টব্য), নিউ ক্যালেডোনীয় যাদের পর্যাপ্ত দেহরোম ও কেশ তরঙ্গিতপ্রায় তাদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্গদের অস্তিত্ব আরও উত্তর-পশ্চিমে, দূর ভারত ও শ্রীলঙ্কায়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব যেখানে ভেদ্দা ও দ্রাবিড়দের মতো অস্ট্রেলীয় সদৃশ নৃবর্গের বাস। কিন্তু এ তথ্য প্রসঙ্গত তাৎপর্যপূর্ণ যে, দ্রাবিড়দের অনেক বৈশিষ্ট্যই ইথিওপীয় নৃবর্গের ঘনিষ্ঠ। সুতরাং একটি সুপ্রাচীন বংশগতি-সূত্রের অস্তিত্ব এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী যা ইউরোপিঅয়েড থেকে শুরু করে শুধু আফ্রিকান নিগ্রোয়েডদের মধ্যেই নয়, ভারতের মধ্য দিয়ে মহাসাগরীয় অস্ট্রালয়েড অবধিও প্রসারিত।

সম্ভবত প্রস্তর যুগের শেষ পাদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রীলঙ্কার ভেদ্দাবর্গের ঘনিষ্ঠ কোন নৃবর্গের উদ্ভব ঘটে। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রাপ্ত অস্থি-অবশেষ
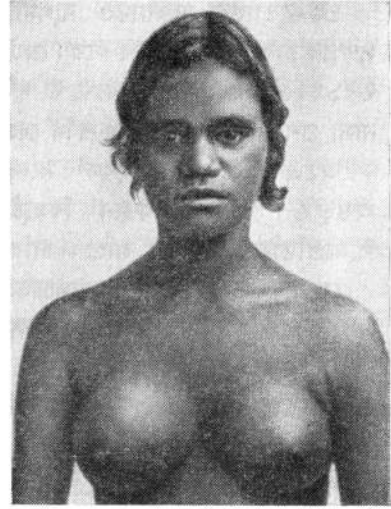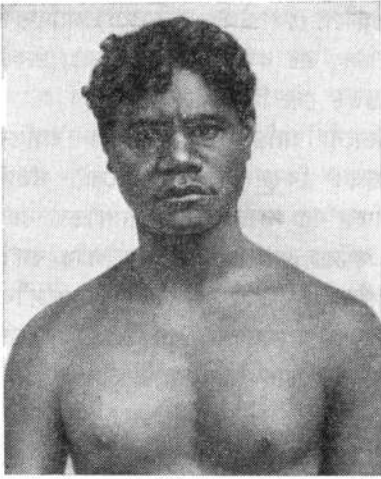
৫১ নং চিত্র: কুইন্সল্যাণ্ডের অস্ট্রেলীয় আদিবাসী; তরুণ (বামে) তরুণী (ডাইনে)
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

থেকে এর আংশিক প্রমাণ লাভ সম্ভব। ১৯৩৬ সালে উত্তর ইন্দোচীনে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তর যুগীয় একটি নরমুণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হয়। উত্তর লাওসের তামপং-এ কিছু কংকালসহ একটি নারীমুণ্ড আবিষ্কৃত হয় এবং তা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। এ মুণ্ডে বিস্ময়করভাবে তিন মহাজাতির চারিত্র্যই চিহ্নিত ছিল, অবশ্য তন্মধ্যে প্রকটতম ছিল অস্ট্রালয়েড ও দক্ষিণ মঙ্গোলয়েড বৈশিষ্ট্য। জাভার গুভা লাভায় প্রাপ্ত নব্যপ্রস্তর যুগের নরমুণ্ডসমূহ অস্ট্রেলীয় ও পাপুয়ান মুণ্ডেরই স্মরণিকা।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণই ছিল অস্ট্রেলীয় ও মেলানেশীয় নৃবর্গের সর্বাধিক সম্ভাব্য আদি বাসস্থান। সম্ভবত অস্ট্রেলীয়দের পূর্বপুরুষগণ ইন্দোচীন থেকে আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, সিরাম, ও নিউগিনি হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইয়র্ক উপদ্বীপে অথবা আরো দক্ষিণের পথে জাভা, সেলিবিস্ ও টাইমোর হয়ে এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে পেঁৗছয়। (৫৯)

পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার উর্বর অঞ্চলে ক্রমবিস্তারের ফলে সম্ভবত তাদের সঙ্গে টাসমানীয়

নৃবর্ণের সংযোগ ঘটে, যারা এদের পূর্বেই অস্ট্রেলিয়ায় আসে এবং তাদের কেউ কেউ ব্যাস প্রণালী পার হয়ে তখন টাসমানিয়ায় পৌঁছেছে।

এই অনুমান প্রাপ্ত ফসিলসমূহ দ্বারা আংশিক সমর্থিত। তালগাইতে প্রাপ্ত নরমুণ্ডটি (৫২ নং চিত্র) ১৪—১৬ বৎসর বয়স্ক তরুণের এবং কোহুনায় আবিষ্কৃত অন্যটি বয়স্কের। ভূতাত্ত্বিক কালক্রমানুসারে এরা আনুমানিক তুষারযুগের অন্তিম পর্বের। শুধু আকৃতির দিক থেকেই নয়, তুলনামূলকভাবে আভ্যন্তরীণ সীমিত পরিসরের জন্যও এগুলো অস্ট্রেলীয় মুণ্ডের সদৃশ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এখনকার অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মুণ্ডের আভ্যন্তরীণ পরিসরের গড় ১,৩০০ সিঃ সিঃ।
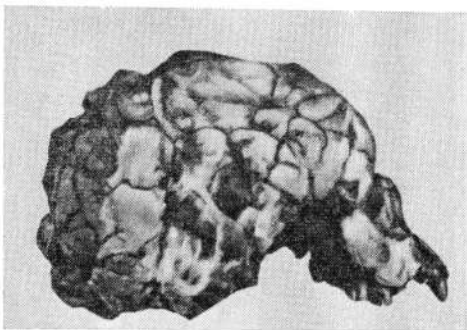
৫২ নং চিত্র: অস্ট্রেলিয়ার তালগাই-তে প্রাপ্ত মুণ্ড

পূর্ণবয়স্ক মানুষের অধিকতর অটুট একটি মুণ্ড আবিষ্কৃত হয় কেইলোর-এ। ভূতাত্ত্বিক কালক্রমানুসারে এ তুষারযুগের শেষ হিমবাহ কালের বয়সী। আকৃতি ও আভ্যন্তরীণ প্রশস্ততর পরিসরের (১,৫৯০ সিঃ সিঃ) জন্য এ মুণ্ড অন্য দুটি অস্ট্রেলীয় মুণ্ড থেকে যথেষ্ট পৃথক। ১৮৯০ সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ইউজিন দ্যুবয় (যিনি পরে পিথেকানথ্রপাস আবিষ্কার করেন) কর্তৃক জাভার ওয়াদ্‌জাক-এ আবিষ্কৃত দুটি মুণ্ডের সঙ্গে এর সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; এ মুণ্ডদুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অটুট মুণ্ডটির (পুরুষ মুণ্ড) আভ্যন্তরীণ পরিসর ছিল ১,৬৫০ সিঃ সিঃ।

ওয়াদ্‌জাক মুণ্ডাবলীর অধিকারী সম্ভবত টাসমানীয়দের পূর্বপুরুষরা। মহাসাগরীয় জাতি যে অস্ট্রেলিয়ায় অতি প্রাচীনকালে পৌঁছেছিল এ থেকে সে তত্ত্বই প্রমাণিত হয়। (অন্য উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছানোর বহু পূর্বেই অস্ট্রেলীয়রা যে এ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পৌঁছেছিল এ তথ্য এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।)

অস্ট্রেলীয় বর্গ অপেক্ষা টাসমানীয় নৃবর্গ কোনক্রমেই কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। দুর্ভাগ্য আজ একটিমাত্র টাসমানীয় মানুষও আর জীবিত নেই। ১৬৪২

৫৩ নং চিত্র: টাসমানীয় নারী: ত্রুগানিনি (বামে) ও প্যাটি ও'কুনিয়েনা (ডাইনে)
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

সালে টাসমান কর্তৃক টাসমানিয়া আবিষ্কারের সময় এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫,০০০। শতাধিক বছর আগে, ১৮৩৪ সালে টাসমানীয়দের জনসংখ্যা ছিল ৫০০০ এবং ইংরেজরা তাদের বিলুপ্তি ঘটায়। অপ্রত্যাশিতভাবে অবশিষ্ট ২০০ টাসমানীয়কে ফ্লিন্ডার্স দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়। এদের সর্বশেষ জীবিত ত্রুগানিনি-র (৫৩ নং চিত্র) মৃত্যু হয় ১৮৭৬ সালে। টাসমানীয়দের আর একটি দল যে অন্য দ্বীপে চলে গিয়েছিল এবং তাদের শেষ জীবিতের মৃত্যু ঘটে আরো পরে — ১৮৯৩ সালে, এ তথ্য ইদানিং আবিষ্কৃত হয়েছে। কিছুসংখ্যক টাসমানীয়রা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদের সঙ্গে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ও ইউরোপীয়দের মিশ্রণ ঘটে (৫৪ নং চিত্র)।

এখন টাসমানীয় জনবর্গ শুধুমাত্র বর্ণনা, ছবি, আবক্ষ মূর্তি, মুণ্ড ও অন্যান্য অস্থি-অবশেষ দ্বারা বিচার্য। এদের কেশ ছিল কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল অত্যন্ত খাটো, চক্ষু অক্ষিগোলকের গভীরে প্রবিষ্ট এবং মুখের লম্বব্যাস বৃহদায়তন ছিল না,
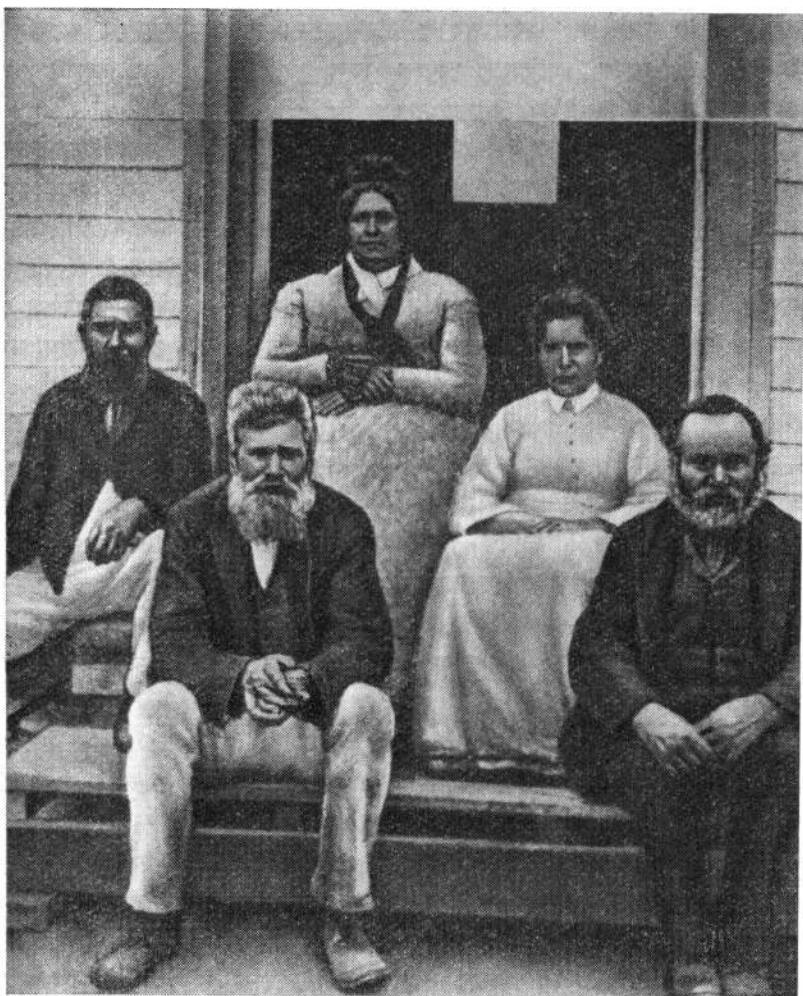
৫৪ নং চিত্র: ইউরোপীয়দের সঙ্গে টাসমানীয় নারীদের বিবাহজাত সন্ততিবর্গ

ঊর্ধ্ব ওষ্ঠের চর্মভাগ প্রসারিত ও যথেষ্ট উত্থিত থাকার জন্য নাসা ও ঊর্ধ্ব ওষ্ঠের মধ্যবর্তী লম্বভাঁজ সুপরিস্ফুট ছিল। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই টাসমানীয়দের স্বকীয়তা চিহ্নিত। করোটিগহ্বর যথেষ্ট উঁচু না হলেও এর আধৃতির গড়

ছিল ১,৪০০ সিঃ সিঃ এবং পর্যাপ্ত বৃহদায়তন। টাসমানীয়রা যে অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র ছিল উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীই তার পর্যাপ্ত প্রমাণ।

অতি প্রাচীনকালে, অস্ট্রেলীয়দেরও অনেক পূর্বে টাসমানীয়রা অস্ট্রেলিয়ায় পেঁছিয় এবং সম্ভবত অধিকতর উর্বর পূর্ব উপকূলে বসতি বিস্তারক্রমে শেষ অবধি প্রণালী অতিক্রম করে টাসমানিয়ায় আসে। এই দ্বীপের নির্জন বিচ্ছিন্নতায় তাদের বহু সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু যারা মূল ভূখণ্ডে ছিল সম্ভবত অস্ট্রেলীয়দের হাতেই তাদের নিঃশেষ বিলুপ্তি ঘটে। এদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল যে একদা টাসমানীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুসিত ছিল কেইলোর-এ প্রাপ্ত প্রাচীন নরমুণ্ডটি সম্ভবত তারই প্রমাণ। যা হোক টাসমানীয়রা মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীদের অন্যতম।

কোন কোন লেখকের মতে আইনু (কুরিল) নৃবর্গও নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত (৭ নং প্লেট দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে জাপানে বসবাসকারী কয়েক সহস্র লোকের এ জনবর্গ বিশেষজ্ঞদের বহুবিধ বিতর্কের কারণস্বরূপ।

কোন কোন নৃতাত্ত্বিক এদের মঙ্গোলয়েড চারিত্র্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যথা — মৃদু হলুদ দেহবর্ণ, অধিকাংশে অক্ষিকোণঝুটির অস্তিত্ব, চ্যাপ্টা ও ঈষৎ অভিক্ষিপ্ত (মধ্যমোদ্গাম্য) মুখমণ্ডল, অনুচ্চিন্ন ছেদন-দন্তগহ্বর।

অন্যেরা অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের সঙ্গে আইনুদের সাদৃশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, যথা উল্লেখ্যরূপ দৃঢ়-গ্রথিত পর্যাপ্ত কেশ ও গাত্ররোম, ঢালু কপাল, মঙ্গোলয়েড অপেক্ষা প্রশস্ততর নাসাতল এবং পুরুষ্টু ওষ্ঠ।

দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা সত্ত্বেও আইনুরা অবশ্যই ইউরোপিঅয়েড জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও বিদেশের কোন কোন বিজ্ঞানী এ মতই পোষণ করেন। এ ধরনের লোকেরা অবশ্য পলিনেশীয় ও অন্য জনবর্গেও পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকেই ইউরোপিঅয়েড চারিত্র্য আবিষ্কারে ইচ্ছুক। আইনুদের বিবিধ দেহবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক গুরুত্ব এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য, তাদের অতীত ইতিহাস ও দক্ষিণ থেকে দেশান্তর গমন ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিবেচনাক্রমে সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিকেরা এ সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন যে আইনুরা মূলত অস্ট্রালয়েড বর্ণ এবং তাদের নব্য চারিত্র্যসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশীয় মঙ্গোলয়েডদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলেই অর্জিত।

৮। মঙ্গোলয়েড মহাজাতি

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে মঙ্গোলয়েডদের সর্বাধিক সম্ভাব্য আদি-আবাস এশিয়ার পূর্বার্ধে অবস্থিত ছিল।(৬০) এই অঞ্চল কোন বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নয়। গিরিপথ, উপত্যকা, এবং নিম্নভূমির মধ্য দিয়ে তারা ইউরোপিঅয়েড ও নিগ্রোয়েড মহাজাতির সঙ্গে অন্তত স্বল্প পরিমাণে যুক্ত ছিল। এদের মধ্যে যারা এ মহাদেশের অভ্যন্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী ছিল তাদের উভয়ের পক্ষেই এ সম্ভাবনা ছিল বাস্তব। যদি ধরে নেয়া যায় যে আদি মঙ্গোলয়েডরা এশিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে তাহলে মঙ্গোলয়েডদের সঙ্গে ইউরোপিঅয়েড ও অস্ট্রালয়েডদের সুপ্রাচীন ও সুগভীর আত্মীয়তার যে ধারণা প্রচলিত তা অধিকতর সমর্থন লাভ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর এশিয়ায় মঙ্গোলয়েড ও ইউরোপিঅয়েডদের মিশ্রণের ফলে উরাল বর্গ (উরাল-ল্যাপ) এবং দক্ষিণ সাইবেরীয় বর্গসমূহের মতো সংযোগী বর্গের উদ্ভব পরবর্তীকালীন ঘটনা রূপেই অবশ্যবিবেচ্য, কারণ শেষ তুষার যুগের পর এ অঞ্চল তুষারমুক্ত হলেই শুধু এরূপ ঘটনা সম্ভবপর ছিল।

প্রটো-মঙ্গোলয়েডদের স্বকীয় জাতিচারিত্র্য কি ছিল? এদের হলদে-বাদামী গাত্রবর্ণ কি দূর দক্ষিণবাসী তাদের পূর্বপুরুষদের গাঢ় গাত্রবর্ণের অবশ্যম্ভাবী বর্ণহীনতার ফল?

এ শেষ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত অস্তিবাচক। মৌলিক জাতি-চারিত্র্য সম্পর্কে যতদূর অনুমান সম্ভব তা থেকে এ বলা যায় যে প্রটো-মঙ্গোলয়েডরা সম্ভবত এ যুগের মঙ্গোলয়েড মহাজাতির স্বকীয় চারিত্র্যের অধিকারী ছিল না। পরবর্তীকালে বিকশিত নব্যমঙ্গোলয়েডদের মুখাবয়ব, নাসা এবং চোখের কোন কোন বৈশিষ্ট্য থেকে এ সত্যই অংশত প্রমাণিত হয়। চর্মাভ্যন্তরীণ চর্বিসঞ্চয়জনিত স্থানীয় স্ফীতিসহ গণ্ডাস্থির প্রকট অভিক্ষেপ, অসমরৈখিক চক্ষু এবং এদের অন্তঃকোণ অপেক্ষা বহিঃস্থ কোণের ঊর্ধ্বাবস্থান, অক্ষিকোণঝুটির অস্তিত্ব ইত্যাকার বৈশিষ্ট্য সকল মঙ্গোলয়েড বর্গে সমভাবে চিহ্নিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্ষিকোণঝুটি মঙ্গোলয়েড বর্গসমূহের খুব কমসংখ্যক লোকের মধ্যেই বর্তমান এবং ইয়েনিসেই অঞ্চলের কেত্‌গণ এবং আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে তা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

স্তেপ ও মরু অঞ্চলের বিশেষ অবস্থায় জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য আত্মরক্ষামূলক অভিযোজনার ফল হিসেবেই সম্ভবত মঙ্গোলয়েডদের মধ্যে স্বকীয়
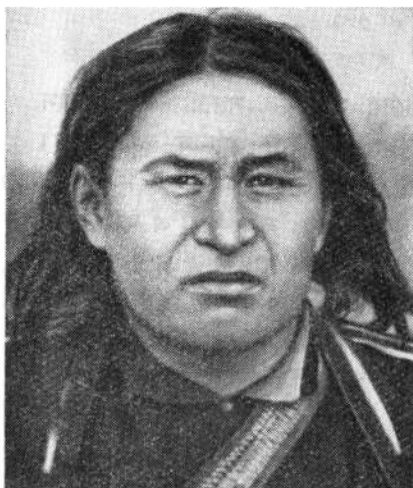
৫৫ নং চিত্র: কেত্
(মঙ্গোলয়েড ও ইউরোপিঅয়েড
মহাজাতির মধ্যবর্তী সংযোগী বর্গ)
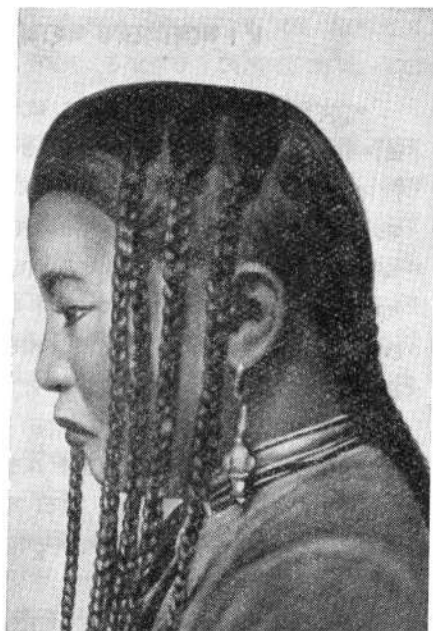
৫৬ নং চিত্র: তুভা নারী
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা)

বৈশিষ্ট্যের আধিক্যসংপৃক্ত যৌগের উদ্ভব ঘটে। অন্যদের মধ্যে স. আ. সেমিয়োনভও এ মতের সমর্থক।(৬১)

সেমিয়োনভের মতে চিকনচেরা চোখ এবং এর স্বল্প দৈর্ঘ্য (অক্ষিকোণঝুটি সহ ঊর্ধ্ব অক্ষিপুটের অত্যধিক বর্ধিত ভাঁজের জন্য) মঙ্গোলয়েড জাতির আবাস স্থলের মহাদেশীয় আবহাওয়ার সঙ্গে বাস্তব অভিযোজনারই ফল। ঘূর্ণীবাত্যার প্রকোপ, মরুময় দেশ, ধূলি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণসমূহের প্রভাব হাজার হাজার বছরে মানবদেহে পরিস্ফুট হয়। এ সঙ্গে অন্যতর একটি কারণও অবশ্য সংযোজনযোগ্য: দীর্ঘ শীতে সারা দেশ তুষারের অত্যুজ্জ্বল আচ্ছাদনে আবৃত থাকে; এ থেকে বিকীর্ণ প্রখর শুভ্রতা (উজ্জ্বল উপরিতল থেকে প্রতিফলিত আলো) অবশ্যই চোখের গড়নকে প্রভাবিত করেছে।

একই পরিবেশে মানব প্রত্যঙ্গের আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত চোখের রক্ষণ প্রকরণ শুধুমাত্র মঙ্গোলয়েডদের মধ্যেই নয়, নিগ্রোয়েডদের মধ্যেও বর্তমান, যথা, দক্ষিণ আফ্রিকার মরুবাসী বুশম্যান।

অতএব এশীয় মহাদেশের অভ্যন্তরে উত্তরাঞ্চলীয় মহাদেশীয় মঙ্গোলয়েড জাতির (৫৫ ও ৫৬ নং চিত্র) উদ্ভব ঘটে এবং সমগ্র মধ্য এশিয়া ও সাইবেরিয়া এরা ও এদেরই বহু বিচিত্র নৃবর্ণ দ্বারা এখন অধ্যুসিত। এসব শেষোক্তদের মধ্যে ইউরোপিঅয়েড মিশ্রণ-উৎপন্ন পরিবর্তমান বা সংযোগী বর্গও অন্তর্ভুক্ত। আদর্শ সাইবেরীয় ও মধ্য এশীয় নৃবর্গের অন্তর্ভুক্ত নৃবর্ণসমূহের (দৃষ্টান্ত, এভেংক্, ৮ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) স্বাতন্ত্র্য নৃতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। উত্তরাঞ্চলীয়দের থেকে দক্ষিণী বর্গসমূহে মঙ্গোলয়েডদের রূপান্তর ঘটেছে দুই মধ্যবর্তী বর্গ অতিক্রম করে — দূরপ্রাচ্য বা পূর্ব এশীয় (উত্তরে চীনা, মাঞ্চুরীয়, কোরীয় এবং অন্যান্য) এবং উত্তর মেরু বর্গ (চুকচি, ৮ নং প্লেট দ্রষ্টব্য ও এস্কিমো)।

৫৭ নং চিত্র: কোয়াংসির দক্ষিণ চীনা (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির দক্ষিণ-পূর্ব শাখা)

দক্ষিণী মঙ্গোলয়েড বা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় জাতি (৫৭, ৫৮ নং চিত্র এবং ৮ নং প্লেট, মালয়ী) দক্ষিণ এশীয় নৃবর্ণসমূহ দ্বারা গঠিত এবং এরা ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীনের অংশে, কোরিয়া ও জাপানে বহুব্যাপ্ত। এই সমগ্র বর্গ সম্ভবত অস্ট্রালয়েড নৃবর্ণসমূহের সঙ্গে আন্তঃমিশ্রণের ফলেই উদ্ভূত। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক এ বর্গের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা ও মালাক্কার সেনোয়া নৃবর্গের অন্তর্গত নৃবর্ণসমূহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন — গাঢ় গাত্রবণ, প্রশস্ত নাসা, পুরুষ্টু ওষ্ঠ যাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। পলিনেশীয় বর্গ দক্ষিণ মঙ্গোলয়েডদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ এবং এরা সংযোগের ফলেই উদ্ভূত, কারণ মঙ্গোলয়েড ও অস্ট্রালয়েড উভয় পূর্বপুরুষই এদের উদ্ভবে অংশগ্রাহী।

পলিনেশীয় ও দক্ষিণ মঙ্গোলয়েডদের মধ্যবর্তী চারিত্রিক সাদৃশ্যসমূহ এরূপ: সরল (কখনও দৃঢ়) কালো কেশ, স্বল্পোদ্ভিন্ন গাত্ররোম, অলিভ-হলুদ গাত্রবর্ণ,

৫৮ নং চিত্র: সুমাত্রা দ্বীপের মুয়ারা গ্রামের কুবু উপজাতির ইন্দোনেশীয় পুরুষ

আংশিক প্রশস্ত মুখমণ্ডল — যা প্রায়ই অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ। অস্ট্রালয়েডদের সঙ্গে সাদৃশ্যের চিহ্ন: প্রশস্ত নাসা, স্বল্প অভিক্ষেপ ও পুরুষ্টু ওষ্ঠ। পলিনেশীয়রা ইউরোপিঅয়েডদের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধারণার কোন প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি নেই।

মনে হয় আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে উত্তর আমেরিকা ও পরে দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে তাদের যাত্রা শুরু করেন সম্ভবত ২৫-৩০ হাজার বছর আগে। এশিয়া থেকে তাদের সম্ভাব্য যাত্রাপথ ছিল তৎকালীন 'বেরিং যোজক' পার হয়ে, বর্তমানে যেখানে প্রণালী অবস্থিত। হিমবাহসমূহের অপসরণ শুরু হলেই কেবলমাত্র এ যোজকে চলাচল সম্ভব ছিল। এর পূর্ব অবধি সমগ্র আমেরিকা মহাদেশ প্রায় জনশূন্য ছিল, কারণ তুষারযুগের সময় উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে (এবং কোন কোন পণ্ডিতদের মতে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ থেকে) সীমিত সংখ্যক বর্গই সম্ভবত সেখানে পৌঁছেছিল। বরফ গলে যাবার পরে এসব যোজক অগম্য হয়ে ওঠে এবং যেসব মঙ্গোলয়েড ইতিপূর্বে সেখানে দেশান্তরিত
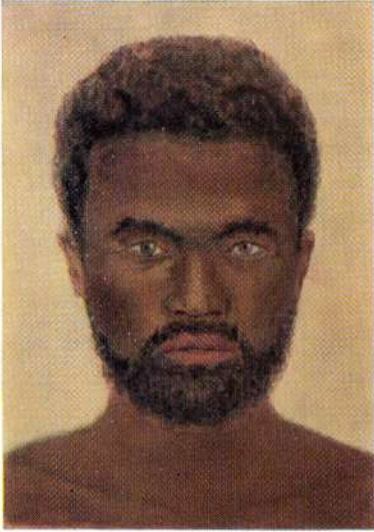
মেলানেশীয়
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)
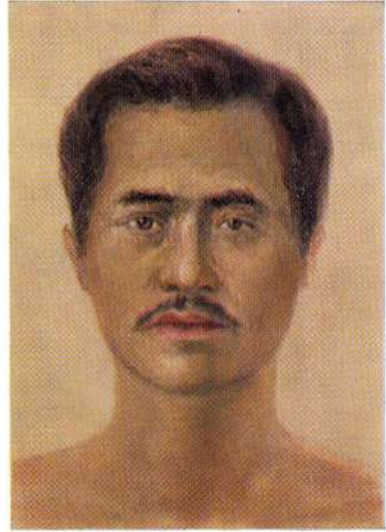
পলিনেশীয়
(নিরক্ষীয় ও মঙ্গোলয়েড মহাজাতির সংযোগী বর্গ)
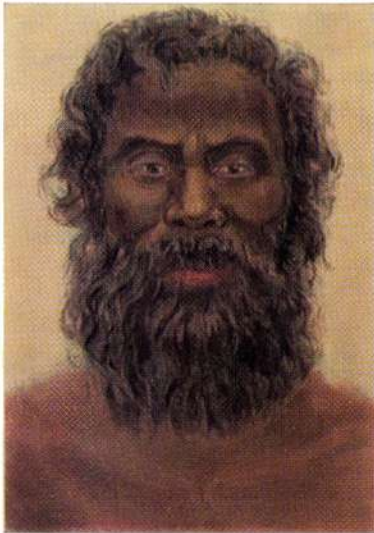
অস্ট্রেলীয়
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)
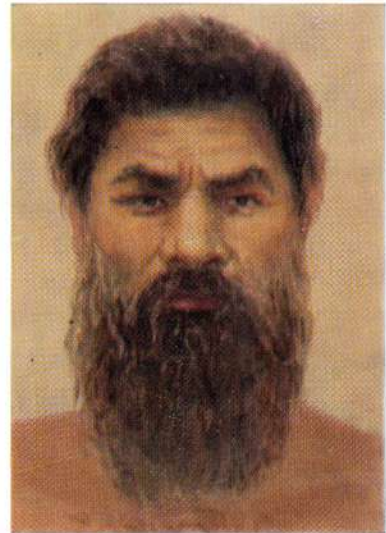
কুরিলীয় বা আইন্
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

চুকচা
(উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব মঙ্গোলয়েড জাতির মধ্যবর্তী সুমেরু-মঙ্গোলয়েড বর্গ)
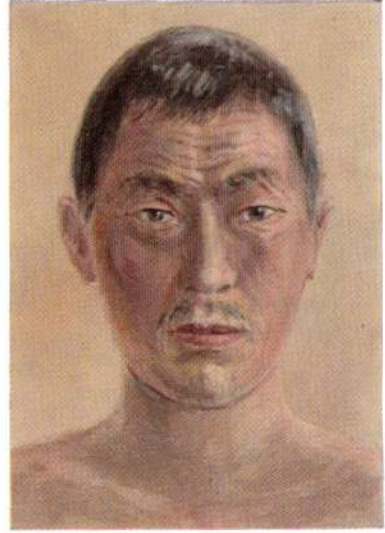
এভেংক্
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা)

উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির আমেরিকান শাখা)
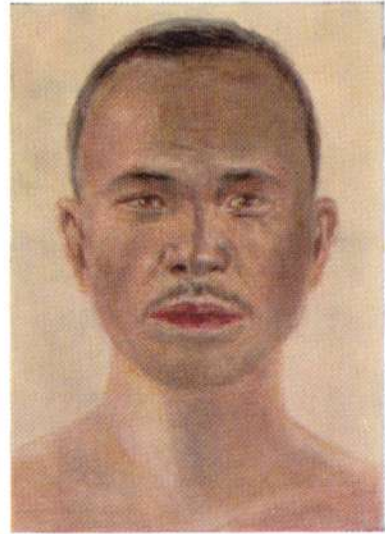
জাভাবাসী মালয়ী
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির দক্ষিণ-পূর্ব শাখা)

৫৯ নং চিত্র: মেক্সিকোর আত্‌স্‌তেক-ইণ্ডিয়ান
(মঙ্গোলয়েড মহাজাতির আমেরিকান শাখা)

হয়েছিল তারা সমগ্র জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেভাবে এর অনেক আগে অস্ট্রেলীয়রা নিজ মহাদেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

রেড ইণ্ডিয়ানগণ ধীরে ধীরে আমেরিকা মহাদেশে বিস্তার লাভ করে এবং কয়েক হাজার বছর ধরে প্রাচীন বিশ্বের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিকাশ লাভ করে। বিশেষভাবে, চাকা ও হল তাদের অজ্ঞাত ছিল এবং আরোহণযোগ্য বা ভারবাহী কোন পশুও তাদের ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও পেরু ও মায়া, মেক্সিকো ও ইউকাতান সভ্যতা থেকে আমরা জানি যে কোন কোন আমেরিকান ইণ্ডিয়ান জনগোষ্ঠী বিকাশের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

মঙ্গোলয়েড জাতির উত্তরাঞ্চলীয় (মহাদেশীয়) অথবা দক্ষিণী (মহাসাগরীয়) এদের কোনটির সঙ্গে আমেরিকান মঙ্গোলয়েডরা ঘনিষ্ঠতর এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রথমে এদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অধিকাংশ রেড ইণ্ডিয়ানদেরই (৫৯ নং চিত্র, ৮ নং প্লেট) কেশ সরল, দৃঢ়, কালো; দেহরোম স্বল্পোদ্‌গত; চক্ষু বাদামী; গাত্রবর্ণ হলদে-বাদামী; মুখমণ্ডল

প্রশস্ত; কপাল খাড়া অথবা ঈষৎ ঢালু; চক্ষু মধ্যম-উন্মুক্ত, ঊর্ধ্ব অক্ষিপুট ভাঁজযুক্ত, কিন্তু অক্ষিকোণঝুটি দুষ্প্রাপ্য এবং কেবলমাত্র পুরুষের মধ্যেই সীমিত; নাসাযোজক অত্যুচ্চ, নাসা বক্র (দৈবাৎ সরল) এবং নাসামূল মধ্যম-প্রশস্ত; ওষ্ঠ মধ্যমাকৃতি কখনও পুরুষ্টু, চিবুক মধ্যমোন্তিন্ন; চোয়াল মধ্যম অথবা ঈষৎ উদ্‌গত তাই মধ্যমোদ্‌গম্যতাই সংখ্যাধিক্য যদিও অনুদ্‌গম্যতাও অপ্রাপ্য নয়; দেহানুপাত মধ্যমাঙ্গীয় বা হ্রস্বাঙ্গীয় অর্থাৎ দেহের তুলনায় পা মধ্যম অথবা খর্বতর; ব্যক্তিক দেহদৈর্ঘ্য দীর্ঘদেহী থেকে খর্বকায় অবধি নানা পর্যায়ে বিভক্ত; মুণ্ডের আকৃতিও অনুরূপ দীর্ঘমুণ্ড থেকে হ্রস্বমুণ্ডের নানা পর্যায় এতে পরিদৃষ্ট; এদের গড়নে অন্যান্য বিভিন্নতাও সহজদৃষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সিরিয়োনো (দক্ষিণ আমেরিকা) উপজাতির কথা উল্লেখ্য। তরঙ্গিত কেশ, পর্যাপ্ত দেহরোম, গাঢ়তর গাত্রবর্ণ, এবং প্রশস্ততর নাসা তাদের মধ্যে সহজদৃষ্ট।

উল্লেখ্য পর্যায়ের এসব বৈচিত্র্য রেড ইণ্ডিয়ানদের মূল জাতি ও উপজাতি সমন্বয়ের জটিলতা এবং উত্তরে আলাস্কা থেকে দক্ষিণে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো অবধি বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলের বহুবিচিত্র পরিবেশে তাদের বসবাস ও বিকাশ লাভের শর্তাবলী থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

রেড ইণ্ডিয়ানগণ মধ্যপ্রস্তর যুগের পূর্বেই যে আমেরিকায় পেঁৗছেছিল তাদের ২৫—৩০ হাজার বছরের পুরানো অস্থি-অবশেষ ও সভ্যতার স্মৃতিচিহ্নে এ প্রমাণ বিধৃত। যে সময় প্রটো-মঙ্গোলয়েড জাতি থেকে তাদের উদ্ভব ঘটে তখন সম্ভবত এশিয়া মহাদেশীয় মঙ্গোলয়েডদের অধিকাংশের বর্তমান বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের চারিত্র্যে প্রকটিত হয় নি। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা আদি মঙ্গোলয়েড শাখা থেকে বিকশিত হয়েছে, তাদের অক্ষিকোণঝুটি প্রায় অদৃশ্য এবং আদর্শ মঙ্গোলয়েডদের তুলনায় নাসাযোজকও উপরে অবস্থিত।

মধ্যপ্রস্তর (বা শেষ প্রত্নপ্রস্তর) যুগের পরবর্তী অপেক্ষাকৃত সীমিত কালপরিসর ও প্রাকৃতিক অবস্থার স্থৈর্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের আদিম নৃতাত্ত্বিক চারিত্র্যসমূহ হারায় নি তথা মঙ্গোলয়েডদের সমগ্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলীও তারা অর্জন করে নি।

কোন কোন রেড ইণ্ডিয়ানদের তরঙ্গিত কেশ (৬০ নং চিত্র) দেখে মনে হয় দক্ষিণ মঙ্গোলয়েড জাতির ঘনিষ্ঠ কারো সঙ্গে অবশ্যই এদের আদি কোন বর্ণের মিশ্রণ ঘটেছিল। এ সত্য অন্যতর তথ্যাদি দ্বারাও প্রমাণসিদ্ধ। কোন কোন সোভিয়েত নৃতাত্ত্বিক (ন. ন. চেবোক্‌সারভ) রেড ইণ্ডিয়ানদের মিশ্র-উদ্ভবে

উত্তরাঞ্চলীয় বা মহাদেশীয় এবং দক্ষিণী বা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় মঙ্গোলয়েড উভয় জাতির অবদান স্বীকারেই অধিকতর উৎসুক।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের গঠনে দক্ষিণী শাখার অধিকতর প্রভাব থাকাই সম্ভব, কারণ এদের মধ্যে দক্ষিণী মঙ্গোলয়েডদের দেহ-বৈশিষ্ট্যেরই সংখ্যাধিক্য। পলিনেশীয়-দের অস্ট্রালয়েড বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে এদের সঙ্গেও রেড ইণ্ডিয়ানরা তুলনীয়। কোন পণ্ডিত যে এই উভয় বর্গের মুখমণ্ডলেই ইউরোপিঅয়েডদের সাদৃশ্যের চিহ্নাবশেষ খুঁজে পান তা (এমন কি ভুল হলেও) একেবারে কারণহীন নয়। অতএব আমাদের জিজ্ঞাস্য: এই দূরস্থ সাদৃশ্যের কারণ কি এই নয় যে পলিনেশীয় (৭ নং প্লেট দ্রষ্টব্য) এবং আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা আদিম কোন এক নৃবর্গ থেকে উদ্ভূত?

৬০ নং চিত্র: পূর্ব বলিভিয়ার রিও পিরাই-এর কুরুঙ্গুয়া-ইণ্ডিয়ান (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির আমেরিকান শাখা)

নব্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রাকৃতিক হেতুসমূহের উপর জাতির চারিত্র্য বিকাশের নির্ভরতার সমস্যাবলী পর্যালোচনার জন্য উষ্ণমণ্ডলীয় ও উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণের নাতিশীতোষ্ণাঞ্চলীয় ইণ্ডিয়ানদের অন্তত আংশিক তুলনামূলক বৈষম্য নির্ণয় প্রয়োজন।

উষ্ণ ও উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় এ নৃবর্ণসমূহের কোন কোন দেহবৈশিষ্ট্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অনুপস্থিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রেজিল ও বলিভিয়াবাসী ইণ্ডিয়ানদের কথা উল্লেখ্য। এদের অনেকেরই গাত্রবর্ণ গাঢ়তর, দেহরোম পর্যাপ্ত, এবং কারো কারো কেশ তরঙ্গিত ও দেহের বাহ্যিক গড়ন স্পষ্টতই উত্তর আমেরিকা বা প্যাটাগোনিয়ার সাধারণ ইণ্ডিয়ানদের থেকে স্বতন্ত্র। পার্থক্যের এই সূত্র থেকেই এ ধারণা উদ্ভূত যে — উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণাঞ্চলের সম্পূর্ণ

ভিন্ন পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলই সম্ভবত এর কারণ। একই পরিবেশে বসবাসের ফলে প্যাটাগোনীয়দের মধ্যে উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের অনুরূপ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ এ প্রত্যয়কেই সমর্থন করে।

প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে উদ্ভূত পার্থক্যের নিরিখে বিভক্ত মঙ্গোলয়েড মহাজাতি প্রসঙ্গে ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির অনুরূপ বিভাগের কথা মনে আসে। এদের বর্ণসমূহ উত্তরে দেশান্তরিত হবার পর শীতল ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দীর্ঘ বসবাসের ফলেই তাদের বর্ণক্ষয় ঘটে। নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড মহাজাতি থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন সম্ভব। অধিকাংশের অতি গাঢ় গাত্রবর্ণ সত্ত্বেও এদের কেউ কেউ কিন্তু হালকা রঙের (দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বুশম্যানদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য)।

জাতি ও জাতিবৈষম্যবাদ

১। জাতিবৈষম্যবাদের মর্মসার

আদিম মানবের একটিমাত্র ধারা থেকে উদ্ভূত মানুষের জাতিসমূহ যথাযথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জৈবিকভাবে একই উপপ্রজাতির বিভাগমাত্র। বিবর্তন প্রসঙ্গে কোন জাতিই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশে অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নততর বা নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত নয়। জাতিসমূহের মূলগত অভিন্নতার প্রশ্নাতীত কারণ এক উৎস থেকে তাদের উদ্ভব এবং শুধুমাত্র তাদের মানুষী দেহবৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যেই নয় আরো গভীরতর পর্যায়েও তা প্রতিফলিত। জীববিদ্যা কিংবা শারীরস্থান-শারীরবৃত্তের দৃষ্টিকোণের বিচারে সার্বিক সাদৃশ্যের তুলনায় স্বল্পসংখ্যক জাতিগত পার্থক্যের গুরুত্ব নিতান্তই গৌণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই অথবা ঘনিষ্ঠ উপজাতির মানুষ সনাক্তকরণেই এর তাৎপর্য সীমিত।

তৎসত্ত্বেও কোন কোন পণ্ডিতের মতে মানুষের বিভিন্ন জাতিবৈশিষ্ট্যের মান প্রজাতি এমনকি গণেরও সম পর্যায়ের এবং এসব বৈশিষ্ট্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত শ্রেণীভিত্তিক গুরুত্ব আরোপক্রমে তারা জাতিসমূহের পার্থক্যকে নিগূঢ়তর করার প্রয়াস পান। এসব পণ্ডিতবর্গের মতে জাতিসমূহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পূর্বপুরুষ-উদ্ভূত। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে এ হল বহুজনি-উদ্ভব তত্ত্ব। বাস্তব সত্য অস্বীকার করে তারা এসব প্রতিপাদ্য সপ্রমাণের চেষ্টা করেন যে, মানুষের জাতিসমূহ অঙ্গ-সংস্থানিক, শারীরস্থানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে বহুদূর বিচ্ছিন্ন বর্গবিশেষ, তারা কোনক্রমেই পরস্পর সম্পর্কিত নয় এবং একে অন্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ প্রত্যয়ানুসারীরা মানুষের একজনি-উদ্ভব তত্ত্ব সমর্থন করলেও তারা একই সঙ্গে মানুষের মধ্যে 'দ্রুতবিকাশমান প্রাগ্রসর' ও 'পশ্চাৎপদ আদিম' জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কেও আস্থাশীল। এই প্রথমোক্তরা উন্নতিশীল কিন্তু এ শেষোক্তদের ক্ষেত্রে আনুগত্য, দাসত্ব ও অবলুপ্তিই নিশ্চিত ভবিতব্য, তাদের উপর শাসন পরিচালনা

এদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার। জাতিবৈষম্যের বাস্তবতার সত্যায়ন ও সমর্থনের জন্যই মানুষের জাতিসমূহের জৈবিক অসাম্যের এ ভ্রান্ততত্ত্বের উপস্থাপনা।

সাধারণত জাতিবৈষম্যবাদীদের মতে 'শ্বেত' জাতি প্রাগ্রসর ও 'অশ্বেত'রা (কৃষ্ণ ও পীত) আদিম রূপে চিহ্নিত। বিশেষভাবে পশ্চিম জার্মানি, আমেরিকা ও বৃটেনের কোন কোন বিজ্ঞানী 'আর্য' তত্ত্বের সমর্থক — যে মতানুসারে উত্তর বা মধ্য ইউরোপীয় জাতির বা তাদের উত্তরপুরুষদের কোন একটি বর্গ 'প্রাগ্রসর জাতি' রূপে স্বীকৃত। মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড জাতিও যে 'প্রাগ্রসর' জাতি একদা এ সম্পর্কেও তত্ত্বাদি প্রচারিত ছিল (এবং এখনও মাঝে মাঝে তা প্রকাশিত হয়)। উদাহরণস্বরূপ জাপানী সামরিক সম্প্রসারণের কালে 'পীত নিম্পন জাতির' প্রাগ্রসরতা তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বৃহৎ শক্তি মতাবলম্বী চীনাদের ভ্রান্ত প্রাধান্যের কথাও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও বিকৃত বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ।

জাতিবৈষম্যবাদীদের মতে স্বল্পসংখ্যক 'প্রাগ্রসর' জাতিই 'আদিম' জাতিসমূহের শ্রম ব্যবহার করে বিশ্বের সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। তারা বলে 'প্রাগ্রসর' জাতিসমূহ 'সক্রিয়' এবং ইতিহাসে তাদেরই মুখ্য ভূমিকা, অন্যপক্ষে 'আদিম' জাতিসমূহ যেহেতু 'নিষ্ক্রিয়' এজন্য তাদের ভূমিকা অধস্তনের। জাতিবৈষম্যবাদীদের অধিকাংশেরই ধারণা সমাজবিকাশের ফল জাতিবৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে না বরং বিপরীতক্রমে জাতিবিশেষের জৈবিক, অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই সমাজ অন্তর্গত মানবগোষ্ঠীর প্রগতি বা অবক্ষয়ের নির্ণায়ক। এভাবেই জাতিসমূহের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক অসাম্যের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রূপে 'জাতিবৈষম্যবাদী তত্ত্ব' উদ্ভূত হল। (৬২)

১৯৬৯ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছে — 'সাম্রাজ্যবাদ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও নিজের প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাতিবৈষম্যবাদকে কাজে লাগায়। ব্যাপকসংখ্যক জনগণ জাতিবৈষম্যবাদ অস্বীকার করে এবং এর বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে তাদের সংহতি সম্ভব। এ পথে যাত্রাকালে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে জাতিবৈষম্যবাদের মূলোচ্ছেদন সাম্রাজ্যবাদ ও তার আদর্শগত বনিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।' (৬৩)

জাতিবৈষম্যবাদীরা শুধুমাত্র ইতিহাসের এ অপ্রতিপাদ্য জীবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই সমর্থন করে না তারা জাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতির মতো বিভাগসমূহকেও অভিন্ন বিবেচনা করে, যদিও পূর্বোক্তরা স্পষ্টতই জৈবিক শ্রেণীবিশেষ এবং শেষোক্তরা

৬১ নং চিত্র: নরওয়েজীয় — দীর্ঘমুণ্ড (বামে) ও গোলমুণ্ড (ডাইনে)

সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত। জাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতি সংক্রান্ত প্রত্যয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি মারাত্মক ত্রুটি।

কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক 'প্রাগ্রসর' জাতিই সংস্কৃতির স্রষ্টা এ প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে বহু তথ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নৃতাত্ত্বিকেরা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, জাতিবৈষম্যবাদীদের মতে সাংস্কৃতিক বিকাশের মান মস্তিষ্কের বৃহদাকৃতির উপর নির্ভরশীল। এ প্রত্যয়ের ভ্রান্তি সম্পর্কে সর্বাধিক যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টান্তের অন্যতম প্রাচীন মিসরীয়দের সাংস্কৃতিক বিকাশের উচ্চতর মান। জার্মান নৃতাত্ত্বিক শ্মিড্‌ট্‌-এর তথ্যানুসারে মিসরীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের করোটির ঘনমান যথাক্রমে ১৩৯৪ ও ১২৫৭ সিঃ সিঃ। অথচ দেখা যায় যে এদের প্রতিবেশী নিম্ন পর্যায়ের সংস্কৃতির অধিকারী জাতিসমূহ অপেক্ষা মিসরীয়দের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্রায়তন (সাধারণ গড় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর) ছিল।

নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদি থেকে এ সত্য প্রমাণিত যে মুণ্ডের আকৃতি ও সংস্কৃতির মান পরস্পর সম্পর্কিত নয় (৬১ নং চিত্র)।

সংস্কৃতি যে জাতিভিত্তিক নয় জার্মান জনগোষ্ঠীই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রোম সাম্রাজ্য যখন গৌরবের তুঙ্গে অবস্থিত, তাদের পূর্বপুরুষরা তখনও বর্বরমাত্র।

পরে জার্মান জনগণ যখন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ লাভ করল তখন জাতিবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই তারা সংস্কৃতির উচ্চ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল। সুতরাং সংস্কৃতি স্পষ্টতই জাতিবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।(৬৪) বন্য অবস্থা থেকে বর্বর ও প্রাগ্রসর পর্যায়ে মানুষের বিকাশে জাতির দেহবৈশিষ্ট্য নিতান্তই তাৎপর্যহীন।

জাতিবৈষম্যবাদীরা তাদের ভ্রান্ত 'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নাছোড়বান্দা কেন? এর উত্তর একান্তই সরল। 'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' জাতিতত্ত্বে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার ও জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধের সমর্থন নিহিত — সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি সঙ্গোপনকারী আদর্শবাদের এ এক মুখোসমাত্র।

জাতিবৈষম্যবাদী দৃষ্টিতে মানবসমাজের শ্রেণীসংগ্রাম ও প্রাণীজগতের অস্তিত্বের সংগ্রাম সমার্থক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রতিক্রিয়াশীল ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্ব এদের হাতিয়ারস্বরূপ। এ তত্ত্বানুসারে আধুনিক মানবসমাজও পশুজগতে প্রচলিত জৈবিক নিয়মেরই অধীন -- অস্তিত্বের নিষ্ঠুর সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং অযোগ্যের বিলয়ই যার বাস্তবতা। ডারউইনবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের মতো জাতিবৈষম্যবাদীরাও মনে করে যে, মানবসমাজ জৈবিক অসাম্যের ভিত্তিতে ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই শ্রেণীবিভক্ত। এভাবেই জাতিবৈষম্যবাদ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অসাম্য ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নিয়মাবলী প্রয়োগে তৎপর। নিজেদের শ্রেণী আধিপত্য রক্ষার প্রয়াসে বুর্জোয়ারা একে আদর্শবাদী তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহার করে।

জাতিবৈষম্যবাদীরাই ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা এবং তাদের মতে বিভিন্ন শ্রেণীর জনবর্গ কিছুসংখ্যক স্বকীয় জাতিবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ তত্ত্বের প্রচারকেরা দাবী করে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনীরা দীর্ঘমুণ্ড এবং দরিদ্রেরা মধ্যম বা হ্রস্বমুণ্ড বর্ণ। এ দাবীর ভ্রান্তি উপলব্ধির জন্য কেবলমাত্র তথ্য পর্যবেক্ষণই প্রয়োজন। সুইডেনের সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগের সময় এক নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে সমৃদ্ধ (বুর্জোয়া) ও দরিদ্র (শ্রমিক ও কৃষক) উভয় শ্রেণীরই মুণ্ডাংক অভিন্ন, অর্থাৎ ৭৭·০। এই একই নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে অবস্থাসম্পন্ন রংরুটদের উচ্চতা ১৭৩·১ সেণ্টিমিটার এবং দরিদ্রদের ক্ষেত্রে তার পরিমাণ ১৭১·৯ সেণ্টিমিটার। দেহদৈর্ঘ্য অবশ্য জাতিচারিত্র্যের ক্ষেত্রে তাৎপর্যহীন এবং এর কারণ পূর্বোক্তদের সুখাদ্য গ্রহণের স্বাভাবিক সুযোগ। এ তথ্যাদি থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, 'জাতি' ও 'শ্রেণী' সংক্রান্ত প্রত্যয়কে মিশিয়ে ফেলা

অনুচিত। মানুষের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস পাঠকালে শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তবতাকে কল্পিত 'জাতি-সংগ্রাম' দ্বারা স্থানান্তরিত করা অসঙ্গত।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, জাতিসত্তার জৈবিক বিভাগের সঙ্গে তার অন্যান্য সামাজিক বিভাগকে যথা রাষ্ট্রীয়জাতি ও শ্রেণীকে মিশিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা জাতিবৈষম্যবাদের এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। যে নীতিবিগর্হিত পন্থায় জাতিবৈষম্যবাদে জাতি রাষ্ট্রীয়জাতি বা শ্রেণী থেকে অভিন্ন, এর লক্ষ্য জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ কিংবা একই জাতির মধ্যে শোষণকে সমর্থন করা। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে জাতিবৈষম্যবাদ অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল।

শোষক শাসকশ্রেণীর সামাজিক দাবী পূরণ করতে গিয়ে জাতিবৈষম্যবাদীরা সত্যকে এতদূর বিকৃত করে যে তারা ভাষার উপরও জাতিবৈশিষ্ট্য আরোপক্রমে মানুষের মানসিকতাকে জাতিচেতনার ফল রূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পায়। (৬৫)

২। জাতি ও ভাষা

স্লাভ সহ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর ভাষার সাদৃশ্য থেকে এদের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রায়শই অনুকূল ধারণা পোষণ করা হয়। যাদের ভাষা থেকে সদৃশ ইউরোপীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত সেই 'সাধারণ পুরুষদের' আবিষ্কারের জন্য বহু ভাষাবিদ নিরলস চেষ্টা করেছেন। এক সময় এরূপ প্রত্যয় প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে প্রাচীন ভারতীয় লিপি সংস্কৃত থেকে 'প্রথম ভাষার' উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি ভারতীয় ও ফার্সী ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষার কিছু সাদৃশ্য অনস্বীকার্য এবং এজন্যই এ ভাষাবর্গ 'ইন্দো-ইউরোপীয়' নামাঙ্কিত।

বহুকাল আগে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী উপজাতিরা অন্য অঞ্চল থেকে ভারত ও পারস্য আক্রমণ ও তা দখল করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। এ বিজয়ীরা তাদের বিজিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী অপেক্ষা নিজেদের 'প্রাগ্রসর' জাতি বলে ঘোষণাক্রমে সংস্কৃত 'আর্য' অর্থাৎ সৎকুলজাত শব্দ দ্বারা নিজেদের আর্য নামে চিহ্নিত করে।

ভারত ও পারস্যের জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মূলগত সাদৃশ্যের জন্য অনেকে এদেঁরও 'আর্য' নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে 'আর্য' শব্দটি কয়েকটি জাতিবর্গের উপর প্রযুক্ত হয় এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল 'তত্ত্ববাগীশ' তাদের ব্যাখ্যায় এ ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যকে অবৈজ্ঞানিক জাতিবৈষম্যবাদী

লেবাসে বিকৃত করে। 'নর্ডিক জাতি'* নামে চিহ্নিত নব্য উত্তর ইউরোপীয় দীর্ঘদেহী, নীলচক্ষু স্বর্ণাভকেশ ও সুবর্ণদেহী জনবর্গকে বহু জাতিবৈষম্যবাদী 'খাঁটি আর্য' রূপে সনাক্ত করে।

ভাষা যদি জাতি-চেতনারই ফলশ্রুতি হয় তাহলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জনতার সমস্ত উত্তরাঞ্চলীয়রা 'আর্য' জাতির দেহবৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী হবার কথা। কিন্তু বাস্তব অন্যরূপ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী কুর্দ এবং আরো বহু জনবর্গের দেহ ও কেশ গাঢ়বর্ণের এবং তাদের মধ্যে হালকাবর্ণের চক্ষুও দুষ্প্রাপ্য। দক্ষিণ ইউরোপের জনগোষ্ঠী আর্য ভাষাভাষী, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই চক্ষু ও কেশ গাঢ়বর্ণের এবং কোনক্রমেই তারা অতিকথিত 'আর্যদের' সদৃশ নয়।

অন্যপক্ষে দীর্ঘদেহী হাল্কাবর্ণের চক্ষু ও কেশযুক্ত ফিন ও এস্তোনীয়রা জাতিবৈশিষ্ট্যে উত্তর ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ কিন্তু ফিন ও এস্তোনীয়দের ভাষা এতদ্‌সত্ত্বেও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যবিহীন।

সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য 'আদি ভাষা' এবং 'আর্য জাতির' সকল বৈশিষ্ট্য সহ 'সাধারণ পূর্বপুরুষ' সংক্রান্ত তত্ত্ব ভ্রান্ত এবং এ সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে নিজেকে 'আর্য' বা 'সৎকুলজাত' বলে জাহির করার অধিকার কোন জাতির নেই।

এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাধারণ নিয়মানুসারে তারা একাধিক নৃবর্ণের সমষ্টি। দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মানির এরূপ ছয়টি বর্ণের কথা উল্লেখ্য।

আফ্রিকায় নিগ্রোয়েডরা তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে, উত্তর আমেরিকায় তাদের ভাষা ইংরেজী এবং দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনিশ ইত্যাদি। সুতরাং একই জাতির বর্গসমূহ যখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয়জাতি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তারা নানা ভাষায় কথা বলে।

এসব তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভাষা জাতিনির্ভর নয়। কোন জাতির 'জৈবিক উত্তরাধিকারে' নিহিত রহস্যময় 'জাতি-চেতনার' অভিব্যক্তি থেকে যে ভাষার উদ্ভব এ ভ্রান্ত তত্ত্বও এতে অপ্রমাণিত হয়। ভাষা সম্পূর্ণভাবে সমাজবিকাশের উপর নির্ভরশীল এবং জনগোষ্ঠীর বিকাশের ধারায়ই তার উদ্ভব, অস্তিত্ব ও বিলয়। জাতির জৈবিক সত্তার সঙ্গে এর কোন নৈমিত্তিক সম্পর্ক নেই।

---

* নর্ডিক — জার্মান শব্দ নর্ড (উত্তর) থেকে উদ্ভূত; এ থেকেই নর্ডবাদ, নর্ডবাদী ইত্যাদি শব্দাবলীর উৎপত্তি যা আমেরিকান জাতিবৈষম্যবাদীদের অতি প্রিয় এবং 'শতকরা একশ' জন ইয়াংকিই যে 'শুদ্ধরক্ত উচ্চজাতির' বংশধর তা প্রমাণে তারা সচেষ্ট।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিবাসী জাতিসমূহ
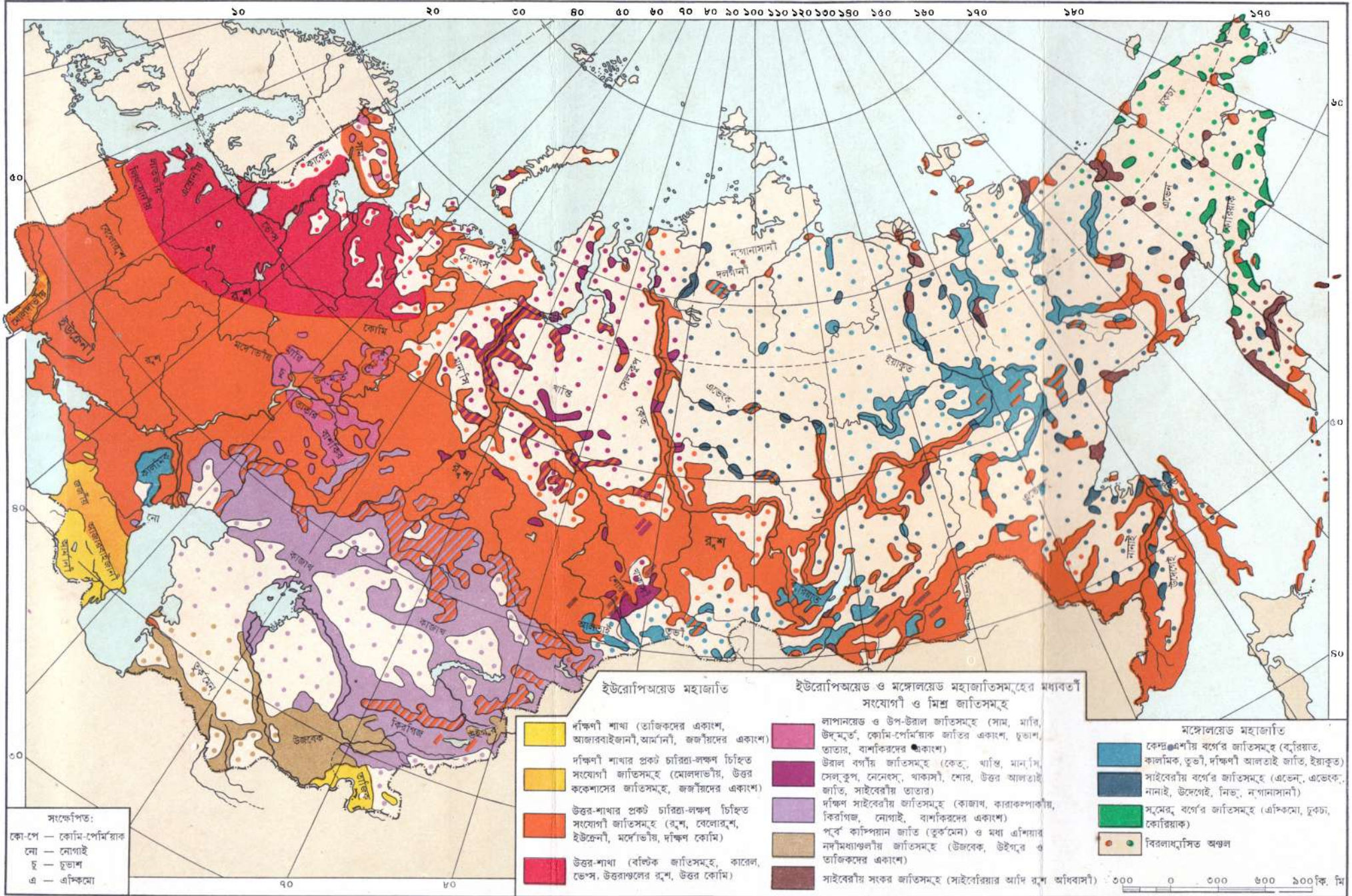
৩। জাতি ও মানসিকতা

দীর্ঘকাল যাবৎ জাতিসমূহের স্বকীয় মানসিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত প্রত্যয় ভ্রান্তভাবে তাদের উপর আরোপিত ছিল। প্রখ্যাত সুইডিস প্রকৃতিবিদ কেরোলাস লিনিয়াসই (কার্ল ফন্ লিনি ১৭০৭-১৭৭৮) দেহবৈশিষ্ট্যভিত্তিক মানুষের জাতিসমূহের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসের অন্যতম প্রথম প্রবক্তা। কিন্তু তার মতানুসারে 'এশীয় মানবের' নিষ্ঠুরতা, বিষণ্ণতা, অনমনীয়তা, লালসা; 'আফ্রিকান মানবের' আক্রোশ, ধূর্ততা, আলস্য ও নিস্পৃহতা; 'ইউরোপীয় মানবের' গতিশীলতা, রসবোধ, আবিষ্কার স্পৃহা (উন্নততর মানসিক গুণাবলী) ইত্যাকার আরোপিত প্রত্যয়সমূহ ভ্রান্তিদুষ্ট। সুতরাং লিনিয়াসের মতে 'শ্বেত' জাতির অবস্থান অন্য জাতিসমূহের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ন্যস্ত।

অথচ ডারউইন এর প্রতিপক্ষে বিভিন্ন জাতির মানুষের সমপর্যায়ের উচ্চ স্নায়বিক কার্যকারিতার মৌলিক সমতা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ফুগিয়ানরা অসভ্যদের মধ্যে নিম্নতম পর্যায়ে ন্যস্ত হলেও এইচ.এম.এস. বিগ্‌ল্-এ এদের তিন আদিবাসীদের দেখে দেখে অবাক হচ্ছিলাম। এরা কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে থেকেছে, কিছু কিছু ইংরাজীও বলতে পারে এবং আমাদের আবেগ ও মানসিক প্রবণতার এরা কতো ঘনিষ্ঠ।' (৬৬)

ফুগিয়ানদের সংস্কৃতির নিম্নমানের সঙ্গে তাদের জাতিগত মানসিক বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্কের কথা ডারউইন কখনই উল্লেখ করেন নি, বরং প্রতিপক্ষে এজন্য তিনি সামাজিক হেতুর সন্ধান করেছেন: 'সম্ভবত ফুগিয়ানরা অন্য কোন আক্রমণকারী দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এ বিমুখ অঞ্চলে বসবাসে বাধ্য হয়েছে এবং ফলত তাদের এ চরম অপকর্ষতা।...' (৬৭)

মুখমন্ডলের পেশীর সাহায্যে আবেগ ও আত্মিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের আলোচনায় ডারউইন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এ ক্ষেত্রে সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্তমান।

অধ্যায়ান্তরে ডারউইন মানব সভ্যতার আদি পর্যায়ের সেই প্রাচীন যুগের পাথরের বর্শা ও তীরমুখের আকৃতি ও নির্মাণ-কৌশলের বিশ্বব্যাপ্ত বিস্ময়কর সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সাদৃশ্যের কারণ ব্যাখ্যায় তিনি সেই প্রাচীন কালেও বিভিন্ন জাতির মানুষের অভিন্ন আবিষ্কার স্পৃহা ও সম-মানসিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিভিন্ন বর্গের মস্তিষ্ক ওজনের কয়েক শত গ্রাম পার্থক্যের ভিত্তিতে জাতিসমূহের মানসিক বৈষম্য সংক্রান্ত তত্ত্বকে সত্যায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা হোক, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা তার মস্তিষ্ক ওজনের ভিত্তিতে নির্ণীতব্য নয়। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্সের মস্তিষ্কের ওজন ছিল মাত্র ১০১৭ গ্রাম এবং রুশ লেখক ইভান তুর্গেনেভের মস্তিষ্ক ছিল প্রায় এর দ্বিগুণ ওজনের, অর্থাৎ ২০১২ গ্রাম। প্রগতিশীল সাহিত্যের লেখক হিসেবে এঁরা উভয়ই সঙ্গতভাবে বিশ্ববন্দিত। (৬৮)

সকল জাতি থেকেই প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব ঘটে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক নেতা বিশ্বখ্যাত — জওহরলাল নেহরু, আহ্‌মেদ সুকর্ণ, কোয়ামি ন্‌ক্রুমা, মদিবো কেয়তা এর স্বল্পসংখ্যক দৃষ্টান্তমাত্র।

এ প্রসঙ্গে প্যাট্রিস লুমুম্বার নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। তিনি কঙ্গোর জনগণের মুক্তি-সংগ্রামে জীবন দান করেন। নিগ্রোয়েড জাতির বহু ব্যক্তি সভ্যতার উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত: বিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম দুব্যয়, প্রখ্যাত গায়ক ও শান্তি সৈনিক পল রবসন, অস্ট্রেলীয় শিল্পী আকাদমিশিয়ান অ্যালবার্ট নামাত্‌জিরা।

বিশেষ বুদ্ধি-অভিজ্ঞা* মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা মানসিক শক্তিতে উন্নততর। এ ধরনের প্রচেষ্টার বহু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিন্তু পরীক্ষার্থীদের সামাজিক স্তর অথবা তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত শিক্ষার প্রতি কখনই দৃষ্টিপাত করা হয় নি। অবশ্য সত্যসন্ধ বিজ্ঞানীরা মানসিক ক্ষমতা নির্ণয়ের এ পরীক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

১৯৩৮ সালে আগস্ট মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক ও জাতিবর্ণনবিদ্যা কংগ্রেসে কিছুসংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান নৃতাত্ত্বিক তাদের

---

* এ পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে এবং প্রদত্ত উত্তরের মাধ্যমে মানসিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্ত শিক্ষার ভিত্তিতে কেবলমাত্র তার মনোবিকাশের পর্যায় নির্ণয় সম্ভব।

অতি উচ্চশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতদের যদি অতি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে শেষোক্তদের মানসিক ক্ষমতার অত্যন্ত বিকৃত ছবিই প্রকটিত হবে। এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল বিজ্ঞানীরা 'শ্বেত' জাতির সঙ্গে তুলনায় 'কৃষ্ণ' ও 'পীত' জাতির 'পশ্চাদ্‌মুখীনতা' 'প্রমাণ' করেন [দ্রষ্টব্য ইয়া. ইয়া. রগিন্‌স্কি কৃত নিবন্ধ, The Science of Races and Racism — এ সংকলন (মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী), সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমি কর্তৃক ১৯৩৮ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত]।

পঠিত নিবন্ধে বংশানুক্রমিক জাতিগত মানস-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। (৬৯) তাদের এ জাতিবৈষম্যবাদ ছিল অত্যন্ত স্থূল। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা তাদের 'হীন জাতি মানসের' জন্যই অবলুপ্তপ্রায় অথচ নিউজিল্যাণ্ডের মাওরীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণে সফল কারণ তারা ইউরোপিঅয়েড জাতির অন্তর্গত, এরূপ ঘোষণায়ও এই নৃতাত্ত্বিকেরা দ্বিধান্বিত হন নি।

কংগ্রেসের অধিকতর প্রগতিশীল অংশগ্রহণকারীরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তারা জনমানসে অবস্থিত কোন জাতিবৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর মানসিক পার্থক্যের কারণস্বরূপ তাদের সাংকৃতিক বিকাশের তারতম্যের বাস্তবতা উল্লেখ করেন। (৭০) 'জাতিগত সহজাত প্রবৃত্তি' থেকেই মানুষের জাতিসমূহের মধ্যে শত্রুতা উদ্ভূত এরূপ দাবীও বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধী।

৬২ নং চিত্র: ন. ন. মিক্লুখো মাক্লাই (১৮৪৬-১৮৮৮)

অনুকূল সামাজিক শর্তে যেকোন জাতির মানুষের পক্ষেই উন্নততর সংস্কৃতি ও সভ্যতা সৃষ্টি সম্ভব। সামাজিক পরিপার্শ্বের প্রকট নির্ণায়ক প্রভাবসমূহই ব্যক্তিমানস, জাতিচারিত্র্য ও তার প্রচেষ্টার নিয়ন্তা। যা হোক, মানসিক কর্মক্ষমতার বিকাশে জাতিচারিত্র্যের ভূমিকা একেবারেই শূন্যের কোঠায়।

প্রখ্যাত রুশ জাতিবর্ণনাবিদ ও নৃতাত্ত্বিক নিকোলাই মিক্লুখো মাক্লাই-এর গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল সাংস্কৃতিক বিকাশের নিম্নপর্যায়ে অবস্থিত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনবর্গের স্বাভাবিক বুদ্ধির মান নিরীক্ষা। তিনি নিউগিনির পাপুয়ানদের সঙ্গে (৬২ নং চিত্র) বন্ধুভাবে বহু বৎসর কাটান এবং তারা যে উচ্চ মানসিক ক্ষমতায় ইউরোপিঅয়েডদের সমকক্ষ এ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। মিক্লুখো মাকলাই যে জেলায় ছিলেন

৬৩ নং চিত্র: নিউগিনির পাপুয়ান
(নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

একদা তিনি তার মানচিত্র আঁকছিলেন। জনৈক পাপুয়ান, যে কোনদিন কোন মানচিত্র দেখে নি সে তাকে লক্ষ্য করছিল। সমুদ্রের উপকূলরেখায় তৎক্ষণাৎ একটি ভুল তার চোখে পড়ল এবং এই পাপুয়ান নির্ভুলভাবে তা সংশোধন করল।

মিক্লুখো মাক্লাই পাপুয়ানদের বুদ্ধিমান, শিল্পরুচিশীল জনগোষ্ঠী রূপে বর্ণনা করেছেন এবং পূর্বপুরুষদের সুদৃশ্য প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ ও সুন্দর অলঙ্কার তৈরীতে তাদের দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন।

বহু বৎসর জাতিবর্ণন ও নৃতাত্ত্বিক নিরীক্ষার ফলে মিক্লুখো মাক্লাই তাঁর রচনায় এ তথ্য প্রমাণে সক্ষম হয়েছিলেন যে পাপুয়ানরা সংস্কৃতির উচ্চতম পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার সম্পূর্ণ যোগ্য এবং এ ক্ষেত্রে তারা ইউরোপীয়দের সমকক্ষ।(৭১)

মানব সভ্যতার আত্মিক ঐশ্বর্যসমূহ আত্তীকরণে কৃষ্ণকায় জাতিসমূহ অক্ষম, জাতিবৈষম্যবাদীদের এ সংস্কারস্পৃক্ত অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের স্বরূপ তাঁর নিরীক্ষার ফলেই উদ্‌ঘাটিত হয়। মিক্‌লুখো ম্যাক্‌লাই মানুষের জাতিসমূহের জৈবিক সাম্য সপ্রমাণের জন্যই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের সমগ্র কাল ব্যয় করেছিলেন। সংস্কৃতির উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবার পক্ষে সকল জাতির সামর্থ্যই যে সম-মানের এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ মনীষী ও বিপ্লবী গণতন্ত্রী নিকোলাই চের্নিশেভ্‌স্কি মানুষের জাতিসমূহ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। (৭২) জাতিগত পার্থক্য ও সাদৃশ্যের বিশদ বিশ্লেষণে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। মানুষের জাতিসমূহ মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তীয় বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত জাতিবৈষম্যবাদীদের এ প্রত্যয় তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ঐতিহাসিক বিকাশের উপর জাতিসত্তার প্রভাব অস্বীকারক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের দাসত্বের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি জাতিবৈষম্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চারিত্র্য উন্মোচন করেন।

জাতি ও জাতিবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত চের্নিশেভ্‌স্কির ধারণাসমূহ দৃঢ়ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক তথ্য সমর্থিত উপাদানে সংগঠিত। ইভান সেচেনভ কৃত স্নায়ুতন্ত্রের শারীরবৃত্তীয় গবেষণা সম্পর্কে তাঁর প্রশংসার শেষ ছিল না। মনোগত দিক থেকে মানুষের জাতিসমূহ পরস্পর সমকক্ষ নয় এরূপ প্রতীতির বিরুদ্ধে এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লিখেছিলেন: 'মানুষের মানসিক কর্মক্ষমতার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তার অনুভব-সামর্থ্য বিভিন্ন যুগে তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বে অপরিবর্তিত থাকে এবং তা জাতি, ভৌগোলিক অবস্থান অথবা সাংস্কৃতিক মানের উপর কখনই নির্ভরশীল নয়। কেবলমাত্র এ শর্তাবলী অবলম্বনেই জাতি নির্বিশেষে বিশ্বমানবের মানসিক ও আত্মিক নৈকট্য সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি সম্ভব। কেবলমাত্র এই পরিপ্রেক্ষিতেই যুগে যুগে পূর্বপুরুষদের ধারণা, অনুভূতি এবং কর্মকাণ্ড আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।' (৭৩)

পূর্বের গোলাম দেশগুলির বেশির ভাগেই, আমাদের যুগে, উপনিবেশবাদীরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারে নি এবং তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছে। এখন খুব কম জাতিই জাতিবৈষম্যবাদের উৎপীড়ন ভোগ করছে। (৭৪) অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদীরা মানবজাতির এ উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করছে এবং নব জাগ্রত জাতিসমূহের অবদমনে তৎপর রয়েছে।

৪। সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি ও রাষ্ট্রীয়জাতিসমূহের সাম্য

জারশাসিত রাশিয়ায় এরূপ বহু জনগোষ্ঠী ও উপজাতি ছিল যাদের কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না এবং তারা চূড়ান্ত আর্থিক ও জাতি নির্যাতনে পীড়িত হত। উজবেক, কাজাখ, কারেল, ইয়াকুত এবং অন্যান্য অ-রুশ জাতিসমূহকে এমনভাবে আখ্যায়িত করা হত যা ছিল তাদের পক্ষে অপ্রীতিকর।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেনেৎস্‌দের কথা উল্লেখ্য। তাদের সামোয়েদ বলে চিহ্নিত করা হত যার অর্থ 'স্বজনভোজী বা নরমাংসাশী'। এ সময় অ-রুশ জনসাধারণকে রুশ-করণের বর্বর নীতি গৃহীত হয় এবং স্থানীয় ও কথ্য ভাষা অবদমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। রুশ শাসকশ্রেণী তাদের হাতে ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় জাতিসমূহের মধ্যে বিবাদের বীজ বপন করত।

প্রধান জাতি হিসেবে রুশ জনগণও স্বৈরতন্ত্র, বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের বর্বর শোষণে নিষ্পিষ্ট ছিল। অভিজাতবর্গ 'নীল রক্তের' উপাখ্যান অনুশীলনে জনগণ তথা 'নিম্নশ্রেণী' থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখতেন।

১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের ফলে শোষকবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়। অতঃপর রাশিয়ার জনগণ বহুজাতিক রাষ্ট্রের সদস্য রূপে সাম্যজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নে সক্ষম হয়। দেশের জনসাধারণ লেনিনের ঘোষিত জাতীয় নীতির ভিত্তিতে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু করে।

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীনে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং জাতীয় অঞ্চলসমূহ ক্রমে গঠিত হল। আমূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে দেশবাসী মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটাল, ফলত উল্লেখ্য পরিবর্তন সূচিত হল তাদের জীবন পদ্ধতিতে এবং জাতিসমূহের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটল দ্রুতগতিতে।

সোভিয়েত শাসনের প্রথম বছরগুলিতেই জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক বিকাশ স্পষ্টতর হল; সর্বত্র নির্মিত হল স্কুল, বিলীন হল নিরক্ষরতা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হল স্থানীয় ভাষায় এবং জাতীয় সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত উন্নীত হল উচ্চতর পর্যায়ে। স্থানীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানকর্মীর" সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। জারশাসিত রাশিয়ার 'প্রত্যন্ত' অঞ্চলবাসী তাজিক, মারি, কোমি, এভেংক্ ও অন্যান্য জনবর্গ, যারা ক্রমাগত অবক্ষয়ে বিলুপ্তির স্তরে উপনীত

হয়েছিল তারা দ্রুত তাদের প্রাক্তন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্মুখীনতাকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হল।

লেনিনের জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের অটল সিদ্ধান্তের ফলেই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হল ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর।

এভাবেই বহুপূর্বে ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে লেনিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হল: 'আমি স্থিরনিশ্চিত যে বিভিন্ন স্বাধীন জাতিসমূহের রাষ্ট্রজোট ক্রমে ক্রমে অধিক সংখ্যায় বিপ্লবী রাশিয়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবে। এ যুক্ত রাষ্ট্রসংস্থা হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাভিত্তিক, এতে কোন মিথ্যাচার ও বলপ্রয়োগের অবকাশ থাকবে না এবং এ হবে দুর্ভেদ্য।' (৭৫)

বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র অঞ্চলসমূহ ও রাজ্যের ইতিহাস থেকে এ সত্য আজ প্রমাণিত যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জনবর্গ — ক্ষুদ্র জাতি বা ক্ষুদ্রতর অধিজাতি তাদের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম। (৭৬) পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্র থেকে নবজাগ্রত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় ঘটেছে। সোভিয়েত আইনে সকল জাতি ও অধিজাতিসমূহের সমানাধিকার স্বীকৃত।

সোভিয়েত সংবিধানের উদ্ধৃতি : 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিক তাদের জাতীয়তা ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারী এবং এ আইন অপরিবর্তনীয়।'

'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যেকোন ভাবেই হোক অধিকার সংকোচন অথবা বিপরীতক্রমে নাগরিক বিশেষের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা সৃষ্টি, এবং জাতি বা জাতীয়তা সম্পর্কে কোন বৈষম্য বা ঘৃণা কিংবা তাচ্ছিল্য প্রকাশ আইনানুসারে দণ্ডনীয়।'

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন: 'এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের অহংকারী চিন্তা, বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত অসাধারণত্বের উন্মাদ কল্পনা সোভিয়েত দেশের মানুষ ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য বলে মনে করে। সোভিয়েত জনগণ আন্তর্জাতিকতাবাদী। আমাদের পার্টি ও সমস্ত বাস্তবতা সোভিয়েত জনগণকে এই শিক্ষাই দেয়।' (৭৭)

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু অধিজাতি যারা বিভিন্ন জাতিবর্গ দ্বারা গঠিত (২ নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য) তাদের সকলেই রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অঞ্চলে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের বহু দৃষ্টান্তের অন্যতম উদ্‌মুর্তগণ।

বিপ্লবের পূর্বে ভুলক্রমে এরা ভোতিয়াক নামে চিহ্নিত ছিল। সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের আগে উদ্‌মুর্তিয়া জারশাসিত রুশ দেশের একটি অনুন্নত প্রদেশ ছিল এবং এর জনগণের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। দারিদ্র্য ও রোগের প্রকোপে উদ্‌মুর্ত জনগণ তখন বিলুপ্তির মুখে।

সোভিয়েত আমলে উদ্‌মুর্তিয়া এখন একটি প্রগতিশীল প্রজাতন্ত্র, এর শিল্পসংস্থা বিশাল এবং যৌথখামার পরমোৎকৃষ্ট। উদ্‌মুর্তদের পূর্বতন অলিখিত ভাষা এখন লিপিবদ্ধ, স্কুলের পাঠ্য ভাষাও উদ্‌মুর্ত এবং এরই সমান্তরালে রুশ ভাষা পঠিত। এ প্রজাতন্ত্রের স্কুল সংখ্যা বহু এবং সাত বছর স্কুলশিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। এ প্রজাতন্ত্রের সাহিত্যও বিকাশমান। উদ্‌মুর্তগণ তাদের নিজের ভাষায়ই এখন মার্কস ও লেনিনের অবিস্মরণীয় রচনাবলী এবং শ্রেষ্ঠ রুশ ও বিশ্ব সাহিত্য পাঠে সক্ষম। উদ্‌মুর্ত স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ইঝেভ্‌স্ক্‌ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোন্নত ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। এর শিল্প-কারখানার সংখ্যা বহু, উচ্চতর বিদ্যায়তন অনেকগুলি এবং তাছাড়াও এখানে আছে বহু গবেষণা ইনস্টিটিউট, থিয়েটার, সঙ্গীত শিক্ষা সমিতি ও বেতার কেন্দ্র। লাইব্রেরী, ক্লাব, সিনেমা এবং আরো বহু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংস্থা সারা প্রজাতন্ত্রে অজস্র সংখ্যায় প্রক্ষিপ্ত। এখন সেখানে বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ, পশুপ্রজনক, এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও শিক্ষায় নিবিষ্ট এক আশ্চর্য কর্মীদলের উদ্ভব ঘটেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় অংশের উত্তর-পূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী কোরিয়াকদের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতর একটি দৃষ্টান্ত এখন আলোচিত হোক। কোরিয়াক জাতীয় অঞ্চল সীমার সকল জনবর্গই এর অন্তর্গত। এরা দুই বর্গে বিভক্ত। এদের একদল বল্গা-হরিণ প্রজনক যাযাবর, অন্য দল স্থায়ী বাসিন্দা — একাধারে মাছধরা, শীল ও সিন্ধুঘোটক শিকার এবং ফল সংগ্রহও যাদের পেশা।

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ফলে কোরিয়াক অর্থনীতির প্রাচীন শাখাসমূহ পুনর্গঠিত হয়েছে এবং নতুন ব্যবস্থার পত্তন ঘটেছে। জনসাধারণ সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছে। জেলেরা এখন চামড়ার কায়াকের বদলে মটর-বোট এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে। তাদের রয়েছে মৎস্যশিকার সমবায় ও মটর-বোট স্টেশন। গৃহী কোরিয়াকগণ শব্জীচাষ ও গব্যশালা স্থাপনে সাফল্য লাভ করছে। আরামদায়ক গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং বহু গ্রামে এখন বিদ্যুৎ ও রেডিও আছে।

বল্গাহরিণ প্রজনন এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত ও পশুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নিষ্পন্ন। বল্গাহরিণ প্রজনক কোরিয়াকগণ এখন গৃহীজীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। তাদের স্থানীয় ভাষা এখন লিপিবদ্ধ এবং কোরিয়াক ভাষায় গ্রন্থাদিও প্রকাশিত। কোরিয়াকদের লেখ্য ভাষার ভিত্তি পশু-প্রজনক কোরিয়াকে চাভ্চুভেনদের কথ্য ভাষা। স্কুল যাবার বয়সে শিশুরা এখন স্বাভাবিক শিক্ষালাভ করে এবং দূরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক স্কুলের ব্যবস্থা রয়েছে। অজস্র চিকিৎসা সংস্থা সেখানে পরিকল্পিতভাবে সর্বত্র সুবিন্যস্ত। উচ্চশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, প্রকৌশলী ও চিকিৎসকদের একটি বৃহৎ দল এখন সেখানে সুসংগঠিত।

প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রেরই নিজস্ব বিজ্ঞান আকাদমি রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবপূর্ব কালে রুশ ব্যতীত অন্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৪৫টিরও অধিক ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তন্মধ্যে বিপ্লবপূর্ব কালে প্রায় ৪০টি ভাষাই ছিল লিপিহীন।

বহু জনবর্গ যারা একদা সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এখন তারা শিল্পে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। কাজাখ জাম্বুল ও লেজগিন (দাগেস্তানে) সুলেমান স্তাল্স্কি তাদের উদ্দীপক রচনার জন্য সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বহির্বিশ্বেও স্বনামখ্যাত। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণকাজ বিশাল পরিসরে অগ্রসরমান। এর সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী অনুসারে বিশ বছরে কমিউনিজমের বস্তুগত ও প্রকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণ লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

১৯৮০ সাল অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের বস্তুগত ও প্রকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে সমগ্র জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব ও আত্মিক উপকরণের প্রাচুর্য উচ্ছ্রিত হবে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনানুগ বণ্টনের মহান নীতি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তির একীভূত অস্তিত্বের উদ্ভব ঘটবে। এভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের যথাযথ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবে।

কমিউনিজম নির্মাণের পূর্ণতর পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে এখন এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে, যার ফলে এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি সাধিত হবে এবং জাতিসমূহ পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর হবে।

জনবর্গের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতার বীজ বিক্ষেপনই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারিত জাতিবৈষম্যবাদী তত্ত্বসমূহের লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কাছে মানববিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের পরাজয় অবধারিত। সমাজতন্ত্র এখন বিশ্বে ক্রমপ্রসারমান, এর নীতি সকল জাতির, অধিজাতির সমানাধিকার এবং এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ কর্তৃক অনুসৃত নিগূঢ় মানবিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিরই অংশ বিশেষ।(৭৮)

১৩-১৪। ভারতীয় উপমহাদেশের পুরুষ ও নারী (ইউরোপিঅয়েড মহাজাতির দক্ষিণ শাখা)

১৫। শ্রীলঙ্কার তামিল (নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখা)

১৬। ইন্দোচীনের বর্মী নারী (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির দক্ষিণ শাখা)

১৭-১৮। জাপানী পুরুষ ও নারী (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা ও নিরক্ষীয় মহাজাতির মহাসাগরীয় শাখার মধ্যবর্তী সংযোগী বর্গ)

১৯-২০। আলাস্কার অন্তর্গত বেরিং সাগরের এস্কিমো পুরুষ ও নারী (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তর শাখা)

২১-২২। মধ্য আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান পুরুষ ও নারী (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির আমেরিকান শাখা)

২৩-২৪। টিয়েরা ডেল ফুয়েগো-বাসী প্যাটাগোনীয় পুরুষ ও নারী (মঙ্গোলয়েড মহাজাতির আমেরিকান শাখা)

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪

পরিশিষ্ট —১
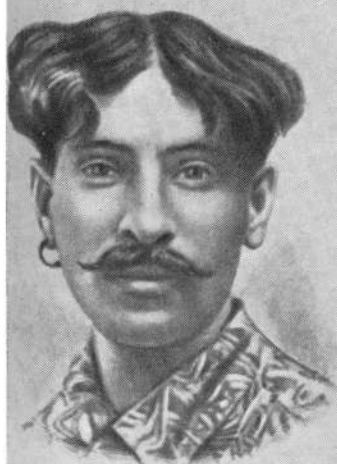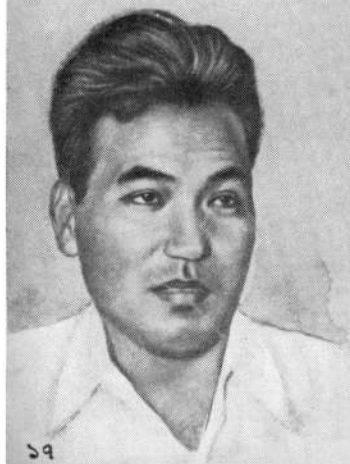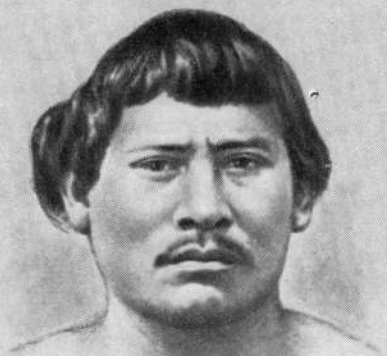
জাতিসমস্যার
জীবতাত্ত্বিক প্রত্যয় সম্পর্কে প্রস্তাব

(ইউনেস্কো, জাতিসমস্যার জীবতাত্ত্বিক সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সম্মেলন; মস্কো, ১২-১৮ আগস্ট, ১৯৬৪)

জাতি সমস্যার জীবতাত্ত্বিক প্রত্যয় এবং বিশেষভাবে জাতি ও জাতিগত কুসংস্কার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের জীবতাত্ত্বিক অধ্যায়টি প্রণয়নের জন্য ইউনেস্কো আমন্ত্রিত নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে আলোচনায় মিলিত হন। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এই ঘোষণাপত্র ১৯৫১ সালে গৃহীত জাতি ও জাতিভেদ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রেরই বিকশিত রূপ। এ সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

১) বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষ 'হোমো সেপিয়ন' নামক একটিমাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং একই মূল থেকে উদ্ভূত। কিভাবে এবং কখন জনবর্গের উদ্ভব ঘটেছে শুধু এ প্রসঙ্গ এখনো বিতর্কমূলক।

২) বংশগত বৈশিষ্ট্য ও বংশগতির বুনিয়াদের উপর পরিবেশগত প্রভাবের বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জৈবিক প্রভেদ নির্ণীত। এই হেতুসমূহের পারস্পরিক বিক্রিয়াই বেশির ভাগ বৈসাদৃশ্যের কারণ।

৩) প্রতি জনবর্গের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পার্থক্য অস্পষ্ট নয়। শুদ্ধ বংশগতি চিহ্নিত মানুষের কোন জাতির অস্তিত্ব অলীক কল্পনামাত্র।

৪) ভূখণ্ডের বিভিন্ন আঞ্চলিক জনবর্গের মধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গড় মানগুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। বহু ক্ষেত্রে এ সব পার্থক্য বংশগত বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ পার্থক্য বিশেষ কোন বংশগত বৈশিষ্ট্যের পৌনঃপুন্যেই প্রকটিত।

৫) বংশগত দেহবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন মহাজাতিতে, অতঃপর প্রত্যেক মহাজাতি আরো অধস্তন স্তরে (জাতি, যা জনবর্গের একটি গোষ্ঠী বা কখনো জনবর্গ) বিভক্তকরণের নানা প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও অধিকাংশের মতেই তিনটি মহাজাতির অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

জাতিনির্ণয় প্রকরণে ভৌগোলিক পরিবৃত্তির হেতুসমূহের ভূমিকা অত্যধিক জটিল। এ ক্ষেত্রে যেহেতু প্রকট কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না তাই যেকোন শ্রেণীবিন্যাসেই মানুষকে নির্দিষ্ট সীমাচিহ্নিত বর্গে বিভক্ত করা অসম্ভব। মানব-উদ্ভবেতিহাসের জটিলতার জন্য জাতিভিত্তিক

শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কঠিন সমস্যা লক্ষিত হয়। অন্তর্বর্তী পর্যায়ে অবস্থিত জনবর্গগুলিই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বহু নৃতাত্ত্বিক মানুষের পরিবর্তনশীলতার যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধিক্রমে এ মত পোষণ করেন যে মানব-শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন স্তরের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য খুবই সীমিত এবং এর সাধারণীকরণের ফলে সমস্যার জটিলতাই শুধু বৃদ্ধি পায় না, ক্ষেত্রবিশেষে তা বিপজ্জনকও হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, একই জাতি বা একই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যবর্তী পার্থক্য প্রায়ই দুই জাতি বা জনবর্গের মধ্যবর্তী পার্থক্যের গড় মানের চেয়ে অধিক।

জাতিচারিত্র্য নির্ণয়ে ব্যবহৃত পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলি হয় পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত নতুবা প্রত্যেক জনবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনশীল মাত্রা রূপে প্রদর্শিত। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাক্তি-মানুষের দেহলক্ষণে প্রকটিত বৈশিষ্টাসমূহের সঙ্গে জাতি নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক নেই।

৬) জীবজন্তুর মতো মানুষের প্রত্যেক জনবর্গের বংশানুক্রম-ভিত্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবক হেতুসমূহের আওতাধীন। বংশগতি নির্ধারক ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড অণুর আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত মিউটেশনকে এবং বংশগতির আকস্মিক পরিবর্তনের পৌনঃপুনকে কার্যকরী লক্ষ্যে পরিচালিত করার মধ্যেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা নিহিত। জনবর্গের আয়তন এবং এর অন্তর্গত পরিবার বিন্যাসের উপর এ বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্ভাবনা নির্ভরশীল।

পরিবেশ যেমনই হোক বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সার্বিক ও ভিত্তিগত জৈবিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। যে সব বৈশিষ্ট্য জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের অবলম্বন সেগুলো এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেজন্য জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ কোনক্রমেই জাতিবিশেষের প্রাগ্রসরতা বা আদিমতার নির্ণায়ক নয়।

৭) মানুষের বিবর্তনে তার যে সব বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে এদের গুরুত্ব সর্বাধিক।

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই আজ আমরা মানুষের অবস্থান লক্ষ্য করি। আদিযুগে মানুষের দেশান্তর গমনের মাধ্যমেই এই অবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং অতঃপর এভাবেই ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাদের বিস্তৃতির পরিধি কোথাও প্রসারিত বা সংকুচিত হয়। ফলত, বিশেষ এক পরিবেশে বসবাসের তুলনায় নানা অবস্থার মধ্যে বসবাস করার ফলে তাদের অভিযোজন-সামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটে।

অতীতে বহু সহস্র বৎসর ধরে এভাবে অর্জিত সাফল্যের মূলে মানুষের বংশগতি অপেক্ষা তার সাংস্কৃতিক অবদানই ছিল অধিকতর। নব্যমানবের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরিবর্তনশীল ভূমিকা এভাবেই প্রকটিত।

মানুষের কর্মচাঞ্চল্য ও সামাজিক হেতুসমূহের প্রভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে এবং এরই ফলে তাদের মধ্যবর্তী পার্থক্যগুলির প্রকটতা হ্রাস পেয়েছে। মানব-উদ্ভব ইতিহাসে এ অবস্থার ভূমিকা তুলনামূলকভাবে জীবজন্তুর ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আদিযুগে বিভিন্ন জনবর্গের মধ্যেও যে এ ধরনের মিশ্রণ ঘটেছিল তার বহু প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা অবহিত এবং এ প্রবণতা বর্তমানেও ক্রমবর্ধমান।

এই মিশ্রণের পথে যে সব প্রতিবন্ধ বর্তমান তা শুধু ভৌগোলিকই নয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকও।

৮) ইতিহাসের যুগে মানুষের বিভিন্ন জনবর্গের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটি অস্থায়ী ভারসাম্যে অবস্থিত রয়েছে। এগুলো মিশ্রণ ও উপরোক্ত পৃথকীকরণ প্রকরণের ফল। বৈশিষ্ট্যসূচক চারিত্র্যসমষ্টি দ্বারা নির্ধারিত ঐক্যের মতো মানুষের জাতিসমূহও পুঞ্জীভবন ও পৃথকীকরণ অবস্থায় স্থিত।

পশুদের জাতিসমূহের মতো মানুষের জাতিসমূহের মধ্যবর্তী সীমারেখা এত সুচিহ্নিত নয় এবং এ ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুদের তুলনা একেবারেই অবান্তর কারণ এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে এদের উদ্ভব ঘটে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখীন নির্বাচনের ফলে।

৯) মানবজাতির মিশ্রণের ভূমিকা যে নেতিবাচক এমন প্রত্যয় জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থিত নয়। বরং বলা যায় মিশ্রণের ফল এর বিপরীত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে মিশ্রণের ভূমিকা ইতিবাচক। এজন্য মানবজাতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য একটি সার্বিক ঐক্যে সংহত আছে।

জীবতাত্ত্বিক বিচারে বিবাহের ফলাফল ব্যক্তিক বংশগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল, জাতিবৈশিষ্ট্যের উপর নয়। তাই আন্তঃজাতি বিবাহ নিষিদ্ধ করার পক্ষে কোন জীবতাত্ত্বিক কৈফিয়ৎ নেই, নেই এর বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ।

১০) মানুষ জন্মের পর থেকেই বংশগত নয় এমন অভিযোজনার জন্য ক্রমান্বয়ে অধিকতর পরিমাণে সাংস্কৃতিক উপকরণ পেয়ে আসছে।

১১) সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধসমূহ ভেঙে ফেলে সাংস্কৃতিক হেতুসমূহ বিবাহের পরিধিকে প্রসারিত করেছে এবং ফলত জনবর্গের বংশগত বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত ও এর সঞ্চরণ প্রহত হচ্ছে।

১২) সাধারণত মহাজাতিসমূহের অবস্থান বিশাল বিস্তৃত এবং ভাষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি দ্বারা চিহ্নিত জাতিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, ভৌগোলিক, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কোন জাতি গঠন করে না। জাতির অর্থ শুধুমাত্র জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দ্বারাই নির্ণীত। অবশ্য একই ভাষাভাষী, একই সংস্কৃতির অধিকারী মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বিবাহ সম্পর্কের জন্য ভাষা ও সংস্কৃতির সমাপতন ঘটে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বংশগত গুণাগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

১৩) জাতিসমূহের প্রস্তাবিত অধিকাংশ শ্রেণীবিন্যাসেই মানসিক গুণাগুণ সীমা-নির্ধারক চারিত্র্যগুলির অন্তর্ভুক্ত নয়।

একই জনবর্গের অন্তর্ভুক্ত মানুষের বংশগতির পার্থক্যের ভিত্তিতেই বর্তমান কালের বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রচলিত।

কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জনগোষ্ঠীর বংশগত গুণাগুণের প্রভেদ কখনই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি। প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিপার্শ্বের প্রভাব এ পরীক্ষার উত্তরে যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ যোগ থেকে বংশগতির সম্ভাব্য অংশ পৃথকীকরণের চেষ্টার ফলেই সমস্যাটি অসম্ভব জটিলতায় পর্যবসিত হয়। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র জনবর্গের সাধারণ মানসিক বিকাশের মধ্যে এর সহজবোধী অংশ লক্ষণীয়।

শারীরস্থানিক যে সকল বৈশিষ্ট্যাবলী মানসিক ক্ষমতা পরিস্ফুটনের অনুষঙ্গস্বরূপ এই সব বংশানুক্রমিক চারিত্র্য সার্বিক অর্থে জৈব গুণ হিসেবে চিহ্নিত, কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেঁচে থাকার জন্য এগুলো অপরিহার্য।

বর্তমান কালের সকল মানুষই সাংস্কৃতিক বিকাশের যেকোন পর্যায়ে উত্তরণের পক্ষে সমান সম্ভাবনার অধিকারী এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান তা নির্ণীত তাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস দ্বারা।

কখনো কখনো কোন জাতিবিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রূপে চিহ্নিত হয়। এ ধরনের প্রত্যয়ের ভিত্তি অনিশ্চিত। এ গুণাগুণকে বংশগত বলে মনে করা যায় না, যতক্ষণ না তার উল্টোটা বাস্তবে প্রমাণিত হয়।

দেহবৈশিষ্ট্যের মতো মানসিক বিকাশের পর্যায় ও বংশগত সম্ভাবনার মানদণ্ডে সাংস্কৃতিক সাফল্যের বিচারক্রমে কোন জাতিকে আদিম অথবা প্রাগ্রসর হিসেবে চিহ্নিত করার কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য নয়।

উপরিলিখিত জীবতাত্ত্বিক তথ্যাবলী জাতিবৈষম্যবাদী তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতিবৈষম্যবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গবেষণার ফল বিকৃত করে যারা অবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপর তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি একত্র করা এখন নৃতাত্ত্বিকদের বিশেষ কর্তব্য।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণ:

অধ্যাপক নাইগেল বার্নিকট, (নৃতত্ত্ববিদ্যা ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন, গ্রেট ব্রিটেন);

অধ্যাপক তাদেউশ বেলিৎস্কি, (নৃতত্ত্ববিদ্যা ইনস্টিটিউট, পোল্যাণ্ড বিজ্ঞান আকাদমি, পোল্যাণ্ড);

অধ্যাপক জাঁ বেনোয়া, (মণ্ট্রেয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের পরিচালক, মণ্ট্রেয়ল, কানাডা);

ডাঃ এ. বোইয়ো, (ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত ফেডারেল গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান, প্যাথোলজি ও হেমাটোলজি বিভাগ, লাগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞান স্কুল, লাগোস, নাইজেরিয়া);

অধ্যাপক ভ. ভ. বুনাক, (নৃবর্ণনবিদ্যা ইনস্টিটিউট, বিজ্ঞান আকাদমি, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন);

অধ্যাপক ইয়া. আ. ভালশিক (নৃতত্ত্ববিদ্যা ও জেনেটিক্স বিভাগ, ইয়া. আ. কমেন্স্কি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাতিস্লাভা, চেকোস্লোভাকিয়া);

অধ্যাপক সান্টিয়াগো গেনোভেস, সহসভাপতি (ঐতিহাসিক গবেষণা সম্পর্কিত ইনস্টিটিউট, বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি, মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়, মেক্সিকো);

অধ্যাপক গ. ফ. দেবেৎস্, সভাপতি (নৃবর্ণনবিদ্যা ইনস্টিটিউট, বিজ্ঞান আকাদমি, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন);

ডঃ আদেলাইদা দে দিয়াস-উন্‌গ্রিয়া, (প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়মের পরিদর্শক, কারাকাস, ভেনেজুয়েলা);

অধ্যাপক রবের জেসে*, (নৃতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক মানবেতিহাস মিউজিয়ম, প্যারিস, ফ্রান্স);

অধ্যাপক জাঁ ইয়েনো, বৈজ্ঞানিক পরিচালক (নৃতত্ত্ববিদ্যা ল্যাবরেটরি, বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্স), (সমাজ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, স্বাধীন ব্রাসেল্স্ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেল্স্, বেলজিয়াম);

ডাঃ ইয়াইয়া কান, সহসভাপতি (সেনেগাল জাতীয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন কেন্দ্রের পরিচালক, দাকার, সেনিগাল);

অধ্যাপক কার্লটন এস. কুন, (বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মের পরিদর্শক, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডেলফিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র);

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জী, সহসভাপতি (সমাজবিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের প্রধান, ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ);

অধ্যাপক বের্নার্ড রেন্‌শ্, (প্রাণীতত্ত্ব ইনস্টিটিউট, ওয়েস্টফালিয়া উইলহেল্ম বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনস্টার, পশ্চিম জার্মানি);

অধ্যাপক ইয়া. ইয়া. রগিন্‌স্কি, (মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের প্রধান, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন);

অধ্যাপক ফ্রান্সিস্‌কো সাল্‌জানো, (প্রকৃতিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, পোর্তো আলেগ্‌রে, রিও-গ্রান্দে দো সুল, ব্রেজিল);

অধ্যাপক আল্‌ফ্ সমেরফেল্ট, সহসভাপতি (অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-রেক্টর, অস্‌লো, নরওয়ে);

অধ্যাপক জেম্‌স্ এন. স্পিউলের, সহসভাপতি (নৃতত্ত্ববিদ্যা ফ্যাকাল্টি, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়, আন আরবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র);

অধ্যাপক হিশাশী সুজুকি, (নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, টোকিও, জাপান);

ডাঃ জোসেফ সি. উয়াইনার, (লণ্ডন স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও উষ্মমণ্ডলীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান স্কুল, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন, গ্রেট ব্রিটেন);

ডঃ ভ. প. ইয়াকিমভ, (নৃতত্ত্ববিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন)।

পরিশিষ্ট —২

জাতি ও জাতিগত কুসংস্কার সম্পর্কে ঘোষণাপত্র

(ইউনেস্কো, প্যারিস, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭)

১) মানুষমাত্রেই যে জন্মগত সূত্রে স্বাধীনতা, অধিকার ও সমমর্যাদার দাবীদার সারা বিশ্বে ঘোষিত এই গণতান্ত্রিক নীতি আজ হুমকীর সম্মুখীন — যেখানে মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। জাতিবৈষম্যবাদ আজ মানবপ্রগতির পথে প্রতিবন্ধস্বরূপ। তার হিংস্রতা আজকের দুনিয়ায় একটি প্রকট বাস্তবতা; একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঘটনা হিসেবে এটি মানববিজ্ঞানের সকল গবেষকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

২) জাতিবৈষম্যবাদ তার উৎপীড়িত মানুষের বিকাশে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে, তার অনুসারীদের উপর কুশ্রী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ভার ন্যস্ত করে, জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করে, সারা দুনিয়ায় উত্তেজনা ছড়ায় এবং শান্তি বিঘ্নিত করে।

৩) ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে জাতিবৈষম্যবাদ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রূপে চিহ্নিত হয়। ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে রচিত জাতি ও জাতিভেদ সম্পর্কিত ঘোষণার জীবতাত্ত্বিক যাথার্থ্য পুনর্বিবেচনার জন্য ১৯৬৪ সালে মস্কোয় আয়োজিত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এ অধিবেশনে সমর্থিত হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার লাভ করে:

ক) এ যুগের সকল মানুষ এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ও এক পূর্বপুরুষ উদ্ভূত।

খ) মানুষের জাতিবিভাগ শর্তসাপেক্ষ, গবেষণাভিত্তিক এবং সকল জাতিই যে সমগুণসম্পন্ন এতে এ প্রত্যয় অবশ্য স্বীকার্য। বহু নৃতাত্ত্বিক মানুষের পরিবর্তন-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে জাতি বিভাগের তাৎপর্য বৈজ্ঞানিক অর্থে সীমিত এবং এ ক্ষেত্রে অতি সাধারণীকরণের আশংকাও অমূলক নয়।

গ) জাতিবিশেষের সাংস্কৃতিক সাফল্যের সঙ্গে তার বংশগতির সম্পর্কের পক্ষে আধুনিক জীববিজ্ঞানের কোন স্বীকৃতি নেই। মানুষের এ ধরনের সাফল্য তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ভিত্তিতেই বিচার্য। পৃথিবীর যেকোন জাতি যেকোন পর্যায়ে উত্তরণের পক্ষেই জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম সম্ভাবনাশীল।

জাতিবৈষম্যবাদে মানুষ সম্পর্কিত জীবতাত্ত্বিক প্রত্যয়সমূহ প্রকটভাবে বিকৃত।

৪) মানুষের জাতিসমস্যার সামাজিক দিকের তাৎপর্য তার জৈব-উদ্ভব ইতিহাস অপেক্ষা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। জাতিবৈষম্যবাদই এখন প্রধান সমস্যা। এর ফল সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং তার প্রদর্শনী, অথচ এ ভ্রান্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত ও বিভিন্ন জনবর্গের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য এক্ষেত্রে জীবতাত্ত্বিক তথ্যাবলী বিকৃতভাবে ব্যবহৃত।

৫) বিশেষ কোন জনবর্গ নিজেদের গুণাগুণ বিচারে অন্যান্য জনবর্গকে তুল্য রূপে ব্যবহার করে। বিজ্ঞানে ক্রমোচ্চপর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাসের যে রীতি প্রচলিত জাতিবৈষম্যবাদীরা এ ক্ষেত্রে তা বিকৃত করে শ্রেণীবিন্যাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে সহজাত, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে গ্রহণ করে। তারা বর্তমান বৈষম্যসমূহকে বিভিন্ন জাতির মধ্যবর্তী চিরন্তন পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পায়।

৬) যেহেতু জাতিবৈষম্যবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে এজন্য এর সমর্থকরা এখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্য বজায় রাখায় নিজেদের পক্ষে নতুন যুক্তি প্রদর্শনের জন্য তথ্য সংগ্রহে তৎপর। বিভিন্ন জনবর্গের মধ্যে বিবাহের যে প্রতিবন্ধ বর্তমান — যার হেতু বাস্তব কারণে সৃষ্ট অবস্থা, জাতিবৈষম্যবাদীরা তাকেই ভিন্ন অর্থে নিজেদের তত্ত্বের পক্ষে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। তাদের মতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণ জৈবিক প্রভেদ। কিন্তু বিভিন্ন জনবর্গের মধ্যবর্তী পার্থক্যসমূহের জৈবিক ভিত্তি প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে তারা অন্য তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করে যথা, ঈশ্বরের দয়া, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, জ্ঞান আহরণের ক্ষমতার পার্থক্য বা অন্য কোন তত্ত্ব যা জাতিবৈষম্যবাদী সংস্কারের আবরণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এভাবে জাতিবৈষম্যবাদের নামে আজকের পৃথিবীতে বহু সমস্যা শুধু বক্তব্যেই নয় জাতিবৈষম্যবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও প্রকাশিত এবং এরা সত্য গ্রহণে অস্বীকৃত।

৭) জাতিবৈষম্যবাদের ঐতিহাসিক মূল বর্তমান। এ কোন বিশ্বজনীন সত্য নয়। বহু আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে এ অবক্ষয়িত এক অতীত নিদর্শন হিসেবেই অবস্থিত। ইতিহাসের বহু দীর্ঘ অধ্যায় জাতিবৈষম্যবাদ বিমুক্ত ছিল। কোন দেশ জয়ের ফলে সৃষ্ট অবস্থার মধ্যে নানা পর্যায়ের জাতিবৈষম্যবাদের উদ্ভব ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা উল্লেখ্য। নিগ্রোদের দাসত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা থেকেই পশ্চিম দেশসমূহে জাতিবৈষম্যবাদের উদ্ভব এবং এর লক্ষ্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অটুট রাখা। এর আরো একটি দৃষ্টান্ত ইহুদীবিরোধী তত্ত্ব। অতীতে বহু সমাজে সংকটকালে ইহুদীদের দোষারোপক্রমে এদের উপর নিজেদের দুষ্কর্মের বোঝা চাপানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

৮) জাতিবৈষম্যবাদের অভিশাপ মুক্তির ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রাম এক নতুন সম্ভাবনাস্বরূপ। পরাধীন এবং 'আদিম' রূপে চিহ্নিত কয়েকটি দেশের মানুষ এই প্রথম পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে এসব দেশের মানুষের সম অধিকারভিত্তিক অংশগ্রহণের ফলে জাতিবৈষম্যবাদের ভিত্তি চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে।

৯) একদা যারা জাতিবৈষম্যবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিল এমন কোন কোন জাতি এখন স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজেরাই জাতিবৈষম্যবাদী পথ অনুসরণ করছে। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত এই ঘটনাটি মানুষের সমতা লাভ প্রয়াসের ফলেই উদ্ভূত, জাতিবৈষম্যবাদী তত্ত্বে কার্যক্ষেত্রে পূর্বে

যে সমতা থেকে সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যা হোক জাতিবৈষম্যবাদের এ নব রূপের উদ্ভব মূলত শোষণের ফলে এবং এর কোন জৈবিক ভিত্তি নেই। রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাবই এর উদ্ভবের কারণ।

১০) জাতিবৈষম্যবাদের মুখোস উন্মোচন এবং এর ভ্রান্ততা প্রকাশ করাই জীববিজ্ঞানীর শেষ কর্তব্য নয়। এ সঙ্গে প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে এর উদ্ভবের সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করা। সমাজব্যবস্থার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে সব সময়েই অত্যন্ত উল্লেখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এমনকি একই সমাজব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করেও জাতিবৈষম্যবাদ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন মনোভাব পোষণ সম্ভব। এর কারণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবিকার জরুরী শর্তাবলী।

১১) জাতিগত কুসংস্কারের সামাজিক কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল:

ক) ঔপনিবেশিক সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রায়ই জাতিবৈষম্যবাদের উদ্ভব ঘটে। এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বাস্তব বৈষয়িক অবস্থার ক্ষেত্রেই শুধু বৈষম্য সৃষ্টি হয় না, বড় বড় সহরাঞ্চলে বস্তির উদ্ভব ঘটে — যার অধিবাসীরা আবাস, রাজনৈতিক অধিকার, শিক্ষা ও ন্যায়বিচারের সমানাধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। বহু সমাজে যেকোন প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপই সাধারণ মানুষের ন্যায়নীতি ও মর্যাদার বিরোধী — এতে বিজাতীয়দের প্রবঞ্চনা, ও নিপীড়নই বৃদ্ধি পায়।

খ) ব্যক্তিগত আঘাতবোধ থেকেও কোন কোন মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাতিগত কুসংস্কারবোধের উদ্ভব ও অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। ক্ষুদ্র দল, সংস্থা এবং সামাজিক আন্দোলন কখনো তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জাতিগত কুসংস্কার সংরক্ষণ ও তা প্রচার করে। যা হোক, এ কুসংস্কারসমূহের মূল সমাজসংস্থার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে নিহিত।

গ) জাতিবৈষম্যবাদ স্ব-ক্ষমতা বৃদ্ধিক্ষম। কোন গোষ্ঠীকে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ও তাদের পৃথক করে রাখার ফলে তারা যে সমস্যাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় এজন্য দায়ী করা হয় এদেরই। এ থেকেই জন্ম লাভ করে জাতিবৈষম্যবাদী তত্ত্ব।

১২) জাতিবৈষম্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান উপকরণগুলি হল: যে সামাজিক অবস্থা এ কুসংস্কারের উৎস তার পরিবর্তন, কুসংস্কার-সংক্রমিত ব্যক্তিবর্গের মনোভঙ্গি ও আচরণের বিরোধিতা, মূল ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম।

১৩) এ সত্য এখন সুস্পষ্ট যে কুসংস্কার দূরীকরণে সমর্থ সামাজিক বিন্যাসের মূল পরিবর্তনগুলির জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া এজন্য প্রয়োজন প্রগতির মূল উপকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যান্য উপায়, সরকারী প্রচার ব্যবস্থা, ও আইন ব্যবস্থার দ্রুত ও সফল প্রয়োগ। এতে জাতিগত কুসংস্কারের দ্রুত উৎপাটন সম্ভবপর।

১৪) পারস্পরিক সহমর্মীতা ও মানবিক সম্ভাবনা সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যায়তন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসূ হতে পারে। অন্যদিকে জাতিভেদ ও অসাম্য চিরস্থায়ী করার জন্যও এগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

পৃথকীকরণ ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য শিক্ষার উপকরণ ও সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ সমস্ত দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ধারায় ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন:

এক) পাঠ্য সূচিতে জাতি ও গণ-ঐক্যের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির প্রতিফলন এবং পাঠ্যপুস্তক বা প্রয়োগিক ক্ষেত্রে জাতিবিশেষের প্রতি অসম্মানজনক উল্লেখ বর্জন সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা স্কুলসমূহের কর্তব্য।

দুই) ক। যেহেতু সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ক্রমবিকাশের পথে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করছে সেজন্য স্কুল বা অন্য সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার বাধা বা বৈষম্য ছাড়াই সকল গোষ্ঠীর মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকা জরুরী।

দুই) খ। যেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণে কোন গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের অর্থনৈতিক বা শিক্ষামূলক পর্যায়ে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে এদের দ্রুত উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণই প্রাথমিক কর্তব্য। দারিদ্র্যের ফলে উদ্ভূত সীমাবদ্ধতার প্রভাব যাতে শিশুদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে না পারে সেভাবেই এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে তাদের প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। যে কুসংস্কার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষকদের উচিত তারা নিজেরা এতদ্বারা প্রভাবিত কিনা তা নির্ণয় করা ও এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য অনুপ্রেরণা জাগ্রত করা অপরিহার্য।

১৫) সরকারী ও অন্যান্য সংস্থায় যারা জাতিবৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়েছে তাদের পুনর্বাসন উচিত। এ ব্যবস্থা জাতিবৈষম্যবাদী কার্যকলাপের ফলে উদ্ভূত অবস্থায় শুধু যে সমতার প্রতিষ্ঠা করবে তাই নয়, জাতিবৈষম্যবাদী কার্যকলাপের ধরন ও আচরণ সংবরণের উপাদান হয়েও উঠবে।

১৬) জন সংবাদ-প্রচার ব্যবস্থা জ্ঞান প্রচার ও পারস্পরিক সমঝোতার ক্ষেত্রে যে ক্রমাগত গুরুত্ব অর্জন করছে এর সম্ভাবনাগুলির বিষয়ে আমরা যথেষ্টমাত্রায় অবহিত নই। জাতিগত কুসংস্কার ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদর্শ ও ন্যায়নীতির প্রচারে এ উপকরণগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন। যেহেতু জন সংবাদ-প্রচারের লক্ষ্য দেশের সর্বস্তরের মানুষ যাদের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান, তাই জাতিবৈষম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব লাভের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা আছে। যাদের উপর এ জন সংবাদ-প্রচারের ভার ন্যস্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ তাদের উচিত। এ ক্ষেত্রে কোন জাতিকে হাস্যকর পর্যায়ে অবনমিত করার সকল প্রচলিত চেষ্টা প্রতিহত করার দায়িত্ব তাদের। অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে জাতি উদ্ভব সম্পর্কিত প্রসঙ্গ পরিহার প্রয়োজন।

১৭) সমানাধিকারের বিধিই জাতিবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক কার্যকরী হাতিয়ার। জনগণের মনে সমতাবিধানই এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে গৃহীত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং এসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী আন্তর্জাতিক চুক্তি ও স্বীকৃতিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই জাতিবৈষম্যবাদদুষ্ট সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের সহায়ক হতে পারে।

জাতিভেদ ভিত্তিক জাতিবৈষম্যবাদকে বেআইনী ঘোষণার জন্য আইন প্রণয়ন একটি কার্যকরী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এ বিধি শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থা ও বিচারকমণ্ডলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেই যথেষ্ট হবে না, এজন্য প্রয়োজন সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এর আওতাভুক্ত করা।

আইন প্রণয়ন মাত্রেই যে কুসংস্কারের অবসান ঘটবে এ অবশ্যই অত্যাশা। তবু কুসংস্কারভিত্তিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত ন্যায়নীতি শেষ অবধি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে।

১৮) বৈষম্যবাদপীড়িত নৃবর্ণকে নিজেদের সংস্কৃতি ত্যাগের বিনিময়ে আধিপত্যকারীদের সঙ্গে মেশার সুযোগ কখনো কখনো দেওয়া হয়। এ পরিহারক্রমে নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যবান অনুষঙ্গ রক্ষার জন্য তাদের অনুপ্রেরণা যোগান উচিত। এর ফলে মানবসাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে তারা মূল্যবান অবদানে সমৃদ্ধতর করতে সক্ষম হবে।

১৯) জাতিগত কুসংস্কার ও জাতিবৈষম্যের উদ্ভব ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর অভিঘাতে এবং এর প্রসার বৈজ্ঞানিক সত্যের মুখোস পরে। সেজন্য আজ প্রয়োজন জীববিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও বিজ্ঞান সংলগ্ন অন্য শাখাসমূহে কর্মরত গবেষকদের নিরলস চেষ্টার, যাতে তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী জাতিগত কুসংস্কার প্রচারক ও জাতিবৈষম্যবাদীদের দ্বারা বিকৃত ও ব্যবহৃত হতে না পারে।

ঘোষণাপত্রটি নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিশেষজ্ঞদলে উপস্থিত ছিলেন:

ডঃ আব্দেল রহিম (খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান-অর্থনীতি ফ্যাকাল্টির রাজনৈতিক বিভাগ, খার্তুম, সুদান);
অধ্যাপক জ. বালান্দিয়ে (প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টি, প্যারিস, ফ্রান্স);
অধ্যাপক স. ও. বোর্জো (গুয়ানাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রিও-ডি-জেনিরো, ব্রেজিল);
অধ্যাপক এল. ব্রেইটওয়াইট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, মোনা, জামাইকা);
অধ্যাপক এল. ব্রুম (টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, অস্টিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র);
অধ্যাপক গ. ফ. দেবেৎস্ (সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির নৃবর্ণবিদ্যা ইনস্টিটিউট, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন);
অধ্যাপক ই. জর্জেভিচ (বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টি, বেলগ্রেড, যুগোস্লাভিয়া);
অধ্যাপক কে. এন. ফেরগুসন (হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির ডীন, ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র);
ডঃ ডি. পি. ঘাই (মানববিকাশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, নাইরোবি, কেনিয়া);
ডঃ ল. গুটম্যান (জনমতসংক্রান্ত ইনস্টিটিউট, জেরুসালেম, ইসরায়েল);
অধ্যাপক জে. ইয়েনো (স্বাধীন ব্রাসেল্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সলভেই সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ব্রাসেল্স্, বেলজিয়াম);

অধ্যাপক আ. ক্রসকোভ্স্কা (লদ্জ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, লদ্জ্, পোল্যান্ড);
ডঃ ম. ক. ম্বাই (সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সভাপতি, দাকার, সেনিগাল);
অধ্যাপক জে. রেক্স (ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ডারহ্যাম, গ্রেট ব্রিটেন);
অধ্যাপক ম. প. সলভেইরা (বিজ্ঞান আকাদমির দর্শন বিভাগের পরিচালক, হাভানা, কিউবা);
অধ্যাপক এইচ. সুজুকি (টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগ, টোকিও, জাপান);
ডঃ আর. থাপার (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের লেকচারার, নয়াদিল্লি, ভারতবর্ষ);
অধ্যাপক কে. এইচ. ওয়োডিংটন (এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিষয়ক বংশগতিতত্ত্ব ইনস্টিটিউট, এডিনবরা, গ্রেট ব্রিটেন)।

ব্যবহৃত পরিভাষা সূচি

অক্ষিকোটরোধ্বর্ শিরা — Supraorbital ridge, brow ridge
অক্ষিকোণঝুটি — apicanthus
অক্ষিকনীনিকা — iris
অক্ষিপুট — eyelid
অগ্রবহির্মুখীনতা — forward outward
অতিকথিত — mythical
অধিজাতি — nationalities, small race
অধিবৃত্ত — parabolic
অনুদ্গত — orthognathous
অনুদ্গম্যতা — orthognathism
অন্তঃপ্রজাতি — intraspecies
অপ্রলম্ব — orthocheilous
অবক্ষেপ — deposit
অবজাতি — minor race
অবতল — concave
অভিক্ষেপ, অভিক্ষিপ্ত — prognothism
অভিন্নউদ্ভব — common origin
অভিবাসী — imigrant
অভিযোজনা — adaptation
অশ্রুগহ্বর — lacrimal bay
আদি প্রত্নপ্রস্তর — lower paleolithic
আধৃতি — capacity
উগ্রজাতিবাদ — chauvinism
উচ্চাবচ — relief
উত্তল — convex
উত্থিতি — projection
উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় — subtropical
উপজাতি — tribe
উল্লম্ব — vertical
উল্লুকবৎ — simian
একজনি-উদ্ভব — monogenesis
এপ্ — ape
এপ্ সদৃশ — simian
কর্তন-দন্ত — incisor
করোটিকাংক — cranial index
করোটি গহ্বর — cranial vault
করোটিতত্ত্ব — craniology
কশেরুকা — vertebra
কুণ্ডলী — convolutions
কোমলাস্থি — cartilage
কোষকলা — tissue
কোষ-বাস্তুসংস্থানিক নিরীক্ষা — cytoarchitectonic study
গণ্ডাস্থি — cheeckbone
গাঢ় — dark
গাত্ররোম — tertiary hair

গুরুমস্তিষ্ক গোলার্ধ —	cerebral hemisphere
গ্রন্থিভাঁজক রেখা —	flexor line
ঘর্ষণতল —	grinding surface
চার্মত্বক —	cutaneous membrane
চিবুকপ্রবর্ধন —	chin protuberance
চেলিয়ান —	chellean
চেষ্টাধিষ্ঠান —	motor area
ছক —	table
ছেদন-দন্ত —	canine teeth
জংঘাস্থি —	shinbone
জাতি-জনন —	ethnogenesis
জাতিজনি —	phylogeny
জাতি বংশানুক্রমিক —	ethnogenetic
জাতিবর্গ —	racial group
জাতিবর্ণনবিদ্যা —	ethnography
জাতিবন্ধনবিদ্যা, জাতিতত্ত্ব —	ethnology
জিন —	gene
ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্ব —	social Darwinism
ডারউইনবাদী সমাজতাত্ত্বিক —	social Darwinist
তীরাবস্থান —	sagittal position
দন্ত গহ্বর —	dental cavity
দন্তাবকাশ —	diastem
দীর্ঘকরোটিক —	dolichocranial
দীর্ঘমুণ্ড —	dolichocephalous
দীর্ঘাঙ্গিতা —	dolichomorphy
দীর্ঘাঙ্গীয় —	dolichomorphous
ধবল —	albins
নরবানর —	anthropoid ape
নরসদৃশ এপ্, নরাকার এপ্ —	anthropoid ape "
নাসাদণ্ড —	nasal spine
নাসাপক্ষ —	nasal wing
নাসাপর্দা —	nasal septum

নাসারন্ধ্র —	nostril
নাসাযোজক —	nasal bridge
নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য —	identifying characters
নিষেক —	fertilisation
নীলনদাঞ্চলীয় —	nilotie
নৃকুলবিদ্যা —	ethnology
নৃজাতিবিদ্যা —	ethnic anthropology
নৃজাতিরূপ —	anthropological type
নৃজনন —	anthropogenesis
নৃবর্গ —	anthropological group
নৃবর্ণ —	anthropological type
নৈমিত্তিক সম্পর্ক —	causal relations
পরিব্যক্তি —	mutation
পরিন্যাস —	deposition
পরিবৃত্তি —	variation
পরিবৃত্তিকাল —	transitional period
পশ্চাৎকপাল —	occipital
পার্শ্বচিত্র —	profile
পায়ের গুল —	calf
পেষক-দন্ত —	molar teeth
প্রকল্প —	hypothesis
প্রকার —	form
প্রজ্ঞা-দন্ত —	wisdom teeth
প্রত্নপ্রস্তর —	paleolithic
প্রলম্ব —	prochelious
প্রাক্‌পেষক-দন্ত —	premolar
প্রাবরণ —	overlapping
ফাট —	fissure
রাষ্ট্রীয়জাতি —	nation
বংশ তালিকা —	genealogical tree
বনমানুষী —	simian
বর্গ —	group
বর্ণ —	type
বহুকেন্দ্রিক —	polycentric

বহুজনি-উদ্ভব / বহুরূপ-উদ্ভব — polygenesis
বাহুচর — brachiator
বাস্তুস্থিতিস্থান — ecological niche
বিভেদন — differentiation
বুদ্ধি-অভিক্ষা — intelligence test
বেলে পাথর — sandstone
ভাষাবর্গ language group
ভূচর — ground living
ভূবিস্তারণ — geographical distribution
ভেদ — variety
ভ্রূরেখা — brow arch
মধ্যকরোটিক — mesocranial
মধ্যকপালী — parietal
মধ্যপ্রস্তর — mesolithic
মধ্যমাঙ্গিতা — mesomorphy
মধ্যমাঙ্গীয় — mesomorphous
মধ্যমুণ্ডীয় — mesocephalous
মধ্যমোদ্‌গম্যতা — mesognathism
মহাজাতি — great race
মহাবিবর — foramen magnum
মিথস্ক্রিয়া — interaction
মুখাভিক্ষেপ — facial prognothism
মুণ্ডাংক — cephalic index
যৌগ — complex
লম্বাক্ষ — long axis
লম্বখাদ — vertical groove
লম্বব্যাস — vertical diameter
ললাটাস্থি — frontal bone
শারীরস্থান — anatomy
শারীরস্থানিক / নৃতত্ত্বীয় — anatomo-anthropological
শীর্ষ কর্টেক্স — temporal cortex
শোণীচক্র — pelvis
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি — mucous membrane
সংবিত্তি — consciousness
সংবেদকূর্চ — sensory bristle
সংযোগী বর্গ — contact group
সংস্থিতি — composition
সদৃশজাতিরূপ — physical type
সমতল আনুভূমিক — flat horizontal
সমরূপ-উদ্ভব — monogenesis
সামর্থ্য — capacity
সুস্থিত চারিত্র্য — stable characters
সুমানবপ্রজনবাদী — eugenist
স্কন্ধীয় — cervicial
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য — typical characters
স্বয়ম্ভূ বিকাশ — autochtonous development
হনু — jaw
হন্বস্থি অভিক্ষেপ — maxillary prognothism
হেতু — factor
হ্রস্বকরোটিক — brachycranial
হ্রস্বাঙ্গীয় — brachymorphous
হ্রস্বমুণ্ড — brachycephalous
হ্রস্বাঙ্গিতা — brachymorphy

গ্রন্থপঞ্জী

(১) *Материалы XXIV съезда КПСС,* М., Политиздат, 1971, стр. 18.
Materials of the 24th Congress of CPSU, M., Politizdat, 1971, p. 18.

(২) К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч., изд. 2, т. 3, стр. 19.*
K. Marx and F. Engels, *Collected Works, 2nd ed., Vol. 3, p. 19.*

(৩) *Фридрих Энгельс, Биография,* М., Политиздат, 1970.
F. Engels, Biography, M., Politizdat, 1970.

(৪) К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч., изд. 2, т. 20, стр. 501.*
K. Marx and F. Engels, *Collected Works, 2nd ed., Vol. 20, p. 501.*

(৫) К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч., изд. 2., т. 3., стр. 426.*
K. Marx and F. Engels, *Collected Works, 2nd ed., Vol. 3, p. 426.*

(৬) *Материалы XXIV съезда КПСС,* М., Политиздат, 1971 стр. 30.
Materials of the 24th Congress of CPSU,' M., Politizdat, 1971, p. 30.

(৭) М. В. Ломоносов, *Древняя Российская История.* Полное собр. соч., т. 6, М., изд. АН СССР, 1952, стр. 174.
M. V. Lomonosov, *Ancient Russian History, Collected Works, Vol. 6, M., 1952, p. 174.*

(৮) В. В. Гинзбург, *Элементы антропологии для медиков.* М., Медгиз., 1963.
V. V. Ginsburg, *Elements of Anthropology for Doctors,* M., Medgiz., 1963.

— Т. Д. Гладкова, *Человеческие расы,* М., изд. «Знание», 1962.
T. D. Gladkova, *The Races of Man,* M., Znanie, 1962.
— А. А. Зубов, *Человек заселяет свою планету,* М., География, 1963.
A. A. Zubov, *Man is Populating His Planet,* M., Geographia, 1963.
— Я. Я Рогинский, *Что такое человеческие расы, М.,* изд. «Правда», 1948.
Y. Y. Roginsky, *What are Human Races,* M., Pravda, 1948.

(৯) В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебец, *Краниометрия. Методика антропологических исследований,* М., изд., «Наука», 1964.
V. P. Alekseev, G. F. Debets, *Craniometry. Methods of Anthropological Studies,* M., Nauka, 1964.
— R. Martin, *Zehrbuch der Anthropologie in Systematischen Darstellung.* 2 Auflage, Bde 1-3. Jena 1928.
— Idem: R. Martin, K. Saller, *3 Auflage, um gearbeite und erweiterte von K. Saller.* Bde 1-3, Stuttgart, 1956-1971.

(১০) В. В. Бунак, *Изучение малых популяций в антропологии.* «Вопросы Антропологии», 1965, №. 21, стр. 5-172.
V. V. Bunak, *Studies of Small Populations in Anthropology.* 'Voprosi Antropologii', N. 21., 1965, p. 5-172.
— В. П. Алексеев, *К обоснованию популяционной концепции расы.* В книге: А. А. Зубов, Г. Л. Хить, В. П. Алексеев, *Проблемы эволюции человека и его рас,* М., изд., «Наука», 1968 (см. стр. 228—278 лит.)
V. P. Alekseev, *To Substantiate the Populational Conception of Races.* In the Book: A. A. Zubov, G. L. Khith, V. P. Alekseev, *The Problems of the Evolution of Man and Its Races.* M., Nauka, 1968 (see p. 228-278 bibl.);
— В. П. Алексеев, *О двух противоположных тенденциях в расообразовании.* «Вопросы Антропологии», № 35, 1970, стр. 31-47.
V. P. Alekseev, *On Two Opposite Tendencies of Race Formation* 'Voprosi Antropologii'. No. 35, 1970, pp. 31-47.
— G. A. Harrison, J. Weiner, J. M. Tanner, N. A. Barnicot, *Human Biology. An Introduction to Human Evolution Variation and Growth.* New York and Oxford. Oxford University Press, 1964.

(১১) *The Concept of Race.* Edited by Aschley Montagu. Collier Books. Collier-Macmillan Ltd., London, 1969. p. 270.

— М. Е. Лобашов, *Генетика,* изд. 2ое. изд-во Ленинградского университета, Л., 1967.
M. E. Lobashov, Genetics. 2nd ed., L., 1967.
— Э. Майр, *Зоологический вид и эволюция,* пер, с англ., М., «Мир», 1968.
E. Mair, *Zoological Types and Evolution,* M., Mir, 1968.

(১২) Н. Н. Чебоксаров, *Основные принципы антропологических классификаций.* В сб. «Происхождение человека и древнее расселение человечества», М., изд. АН СССР, 1951, стр. 291-322.
N. N. Cheboksarov, *Fundamentals of Anthropological Classification.* In the Book : «The Origin of Man and the Ancient Migration of the Population », M., 1951, pp. 291-322.

(১৩) Я. Я. Рогинский, М. Г. Левин, Антропология, изд. 2ое, М., изд. «Высшая школа», 1963, стр. 313-477.
Y. Y. Roginsky, M. G. Levin, *Anthropology,* 2nd ed., M., Vischaya Shkola, 1963, pp. 313-477.

(১৪) В. В. Бунак, *Человеческие расы и пути их образования,* «Советская Этнография», № 1, 1956, стр. 86-105.
V. V. Bunak, *The Races of Man and the Ways They Were Formed.* Sovietskaya Etnografia, 1956, No. 1, pp. 86-105.

(১৫) W. C. Boyd, *Genetics and the Races of Man,* Boston, 1950.

(১৬) P. G. Biswas, *Present State of the Problem of Correlation Between Racial and Cast Differentiation in India.* VII Congress International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscow (3 août-10 août 1964), pp. 79-87.
— R. S. Guha, *Racial Affinities of the Peoples of India.* Census of India, Ethnographical, Governement of India, 1935.
— D. N. Majumdar, P. C. Mahalanobis and C. R. Rao, *Anthropometric Survey of the United Provinces: A Statistical Study,* 'Sankhya', Vol. 9, pts 2-3, 1949.
— D. N. Majumdar, C. R. Rao, *Race Elements of Bengal.* Asia Publishing House, 1958.
— D. K. Sen, *The Racial Composition of Bengalis,* Indian Anthropology, Asia Publishing House, 1962.

(১৭) Charles Darwin, *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex,* London, 1901.

(১৮) М. Ф. Нестурх, *Происхождение человека,* М., изд. АН СССР, 1958.
M. F. Nesturkh, *The Origin of Man,* Foreign Language Publishing House, M., 1959.

— Йозеф Аугуста, Зденек Буриан, *Жизнь древнего человека, пер.* с чешского под ред. М. Ф. Нестурха, Прага, 1960, 1963.
Yosef Augusta, Zdenek Burian, *Life of Ancient Man.* Prague. 1960, 1963.
— А. А. Величко, *Связь динамики природных изменений в плейстоцене с развитием первобытного человека.* «Вопросы Антропологии», № 37, 1971, стр. 3-18.
A. A. Velichko, *Dynamics of Natural Changes in Pleistocene and Its Connection with the Development Primitive Man.* Voprosi Antropologii, No. 37, 1971, pp. 3-18.

(১৯) Е. В. Жиров, *Костяки из грота Мурзак-Коба,* «Советская археология», № 5, 1940, стр. 179-186.
Y. V. Zhirov, *Skeletons from Murzak-Koba Grotto.* Sovietskaya Arkheologia, No. 5, 1940, pp. 179-186.

(২০) Г. Ф. Дёбец, *Тарденуазский костяк из навеса Фатьма-Коба в Крыму.* «Антропологический журнал», № 2, 1936. стр. 144-165.
G. F. Debets, *The Tardenoisian Skeleton in the Fatma-Koba Cave in the Crimea.* Antropologicheski Zhurnal, No. 2, 1936, pp. 144-165.

(২১) Г. Ф. Дебец, *Палеонтологические находки в Костёнках,* «Советская этнография», № 1, 1955, стр. 43-53.
G. F. Debets, *Palâeontological Discoveries at Kostyonki,* Sovietskaya Etnografia, No. 1, 1955, pp. 43-53.
— В. П. Якимов, *Скелет ребенка из Костёнок,* «Сборник Музея антропологии и Этнографии АН СССР, № 2, М., 1957, стр. 500-529.
V. P. Yakimov, *Skeleton of a Child from Kostyonki,* Sbornik Muzea Antropologii i Etnografii AN SSSR, No. 2, M., 1957, pp. 500-529.
— Я. Я. Рогинский, *Морфологические особенности черепа ребёнка из позднемустьерского слоя пещеры Староселье,* «Советская этнография», № 1, 1954, стр. 27-47.
Y. Y. Roginsky, *Morphological Features of the Child Skull Found in the Late Mousterian Stratum of the Staroselye Cave,* Sovietskaya Etnografia, No. 1, 1954, pp. 27-47.
— Г. Ф. Дебец, *Скелет позднепалеолитического человека из погребения на Сунгирьской стоянке.* «Советская археология», № 3, 1967, стр. 160-164.
G. F. Debets, *Skeleton of Late Palâeolithic Man from Sungir Locality.* Sovietskaya Arkheologia, No. 3, 1967, pp. 160-164.

— О. Н. Бадер, *Человек палеолита у северных пределов ойкумены,* «Природа», М., 1971, № 5, стр. 36-39.
O. N. Bader, *Palâeolithic Man Near Northern Borders, Priroda,* M., 1971. No. 5 pp. 36-39.

(২২) М. А. Гремяцкий, *Подкумская черепная крышка и её морфологические особенности.* «Русский антропологический журнал», № 12, вып. 1-2, 1922, стр 92-110 и 237-239.
M. A. Gremyatsky, *The Podkumok Cranial Vault and Its Morphological Features,* Russki Antropologicheski Zhurnal, No. 12, 1-2 issues, 1922, pp. 92-110, 237-239.
— М. А. Гремяцкий, *Структурные особенности Подкумского черепа и его древность.* «Антропологический журнал» № 3, 1934, стр, 127-141.
M. A. Gremyatsky, *The Structural Peculiarities of the Podkumok Skull and Its Age.* Antropologicheski Zhurnal, No. 3, 1934, pp. 127-141.

(২৩) Г. А. Бонч-Осмоловский, *Грот Киик-Коба,* «Палеолит Крыма», вып. 1, 1940.
G. A. Bonch-Osmolovsky, *The Kiik-Koba Grotto,* 'Paleolit. Kryma', No. 1, 1940.
— Г. А. Бонч-Осмоловский, *Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба,* «Палеолит Крыма», вып. 2, 1941.
G. A. Bonch-Osmolovsky, *Hand of the Fossil Man of Kiik-Koba Grotto,* 'Paleolit Kryma', No. 2, 1941.
— Г. А. Бонч-Осмоловский, *Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба,* «Палеолит Крыма», вып. 3, изд. АН СССР, 1953.
G. A. Bonch-Osmolovsky. *Skeleton of the Foot and Leg of the Fossil Man from the Kiik-Koba Grotto,* 'Paleolit Kryma', No. 3, 1953.

(২৪) *Тешик-Таш (Палеолитический человек).* Сборник под редакцией М. А. Гремяцкого и М. Ф. Нестурха в трудах Научно-исследовательского института антропологии МГУ, М., 1949.
Teshik-Tash (Palâeolithic Man). Collected Articles, edited by M. A. Gremyatsky and M. F. Nesturkh, M., 1949. Works of the Anthropological Research Institute of MSU, M., 1949.
— В. В. Бунак, *Муляж мозговой полости палеолитического детского черепа из грота Тешик-Таш,* Сборник Музея антропологии и этнографии, т. XII, М. изд. АН СССР, 1951.

V. V. Bunak, *Cranial Cast of Palâeolithic Child Skull from Teshik-Tash Grotto.* Sbornik Muzea Antropologii i Etnografii, Vol. XII, M., 1951.

(২৫) В. В. Бунак, *Происхождение речи по данным антропологии.* В сборнике «Происхождение человека и древнее расселение человечества», М., изд. АН СССР, 1951, стр. 205-290.
V. V. Bunak, *The Origin of Speech According to the Anthropological Materials.* In the Book: «Origin of Man and Ancient Migration of Population», M., 1951, pp. 205-290.

(২৬) Ю. И. Семенов, *О месте «классических» неандартальцев* в человеческой эволюции, «Вопросы антропологии», № 3, 1960, стр.46-65.
Y. J. Semyonov, *The Place of 'Classical' Neanderthalians in the Human Evolution.* Voprosi Antropologii, No. 3, 1960, pp. 46-65.

(২৭) Я. Я. Рогинский, *Некоторые проблемы происхождения человека,* Советская этнография, № 4, 1956, стр. 11-17.
Y. Y. Roginsky, *Some Problems Concerning the Origin of Man,* Sovietskaya Etnografia, No. 4, 1956, pp. 11-17.
— М. И. Урысон, *Начальные этапы становления человека (древнейшие и древние люди).* В сб. «У истоков человечества (основные проблемы человечества)», М., изд. МГУ, 1964, стр. 83-151.
M. I. Urison, *The Beginning Stages of the Formation of Human Beings (Primitive and Ancient Man).* In the Book 'Near the Source of Mankind (Main Problems of Mankind)', M., MSU, 1964, pp. 83-151.

(২৮) М. Ф. Нестурх, *Антропогенез.* В кн.: В. В. Бунак, М. Ф. Нестурх и Я. Я. Рогинский, «Антропология». Учпедгиз, 1941, стр. 13-131.
M. F. Nesturkh, *Antropogenesis.* In the Book V. V. Bunak, M. F. Nesturkh and Y. Y. Roginsky, 'Anthropology'. Uchpedgiz. 1941, pp. 13-131.
— М. Ф. Нестурх, *Приматология и антропогенез (обезьяны, полуобезьзны и происхождение человека),* М., Медгиз, 1960.
M. F. Nestrukh, *Primatology and Anthropogenesis (Apes, Semiapes and Origin of Man),* M., Medgiz, 1960.
— Сб. «Человек (его эволюция и дифференциация)». Труды Московского общества испытателей природы, т. 43, М. изд «Наука», 1972.

'Man (Its Evolution and Differentiation)'. Works of the Moscow Society of Nature Studies, Vol. 43, M., Nauka, 1972.

(২৯) В. П. Якимов, *«Атлантроп» — новый представитель древнейших гоминид.* «Советская этнография», № 3, 1956, стр. 110-122.
V. P. Yakimov, *«Atlanthropus»—a New Representative of Ancient Hominids,* Sovietskaya Etnografia, No. 3, 1956, pp. 110-122.

(৩০) *Ископаемые гоминиды и происхождение человека.* Сб. статей под ред. В. В. Бунака, М., изд. Наука, 1966.
Fossil Hominids and the Origin of Man. Collected Articles, edited by V. V. Bunak, M., Nauka, 1966.
— Ю. Г. Решетов, *Природа земли и происхождение человека,* М., изд. «Мысль», 1966.
Y. G. Reshetov, *Earth's Nature and Origin of Man,* M., Mysl, 1966.

(৩১) В. В. Бунак, *Череп человека и стадии его формирования у ископаемых людей и современных рас.* «Труды института этнографии АН СССР», М., изд. АН СССР, 1959.
V. V. Bunak, *The Human Skull and Stages of Its Formation in Fossil Man and Modern Races.* Works of the Etnographical Institute. M., 1959.
— И. К. Иванова, *Геологический возраст ископаемого человека.* К VII конгрессу GNQUA (США, 1965), т., изд. «Наука», 1965.
I. K. Ivanova, *Geological Age of Fossil Man.* VII Congress of the GNQUA (USA, 1965), M., Nauka, 1965.
— М. Ф. Нестурх, *Происхождение человека.* изд. 2ое, переработанное и дополненное, М., изд. «Наука», 1970.
M. F. Nesturkh, *The Origin of Man.* 2nd ed., revised and with addition, M., Nauka, 1970.

(৩২) М. М. Герасимов, *Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек),* М., изд. АН СССР, 1955.
M. M. Gerasimov, *Reconstruction of Face from Skull (Modern and Fossil Man),* M., 1955.
— М. М. Герасимов, *Человек каменного века,* М., изд. АН СССР, 1964.
M. M. Gerasimov, *The Stone Age Man,* M., 1964.

(৩৩) М. Ф. Нестурх, *Ископаемые антропоиды и древнейшие гоминиды,* «Успехи современной биологии». т. IX, вып. 2, М., 1938, стр. 161-202.

M. F. Nesturkh, *Fossil Anthropoids and Ancient Hominids,* 'Uspekhi Sovremenoi Biologii', Vol. IX, No. 2, M., 1938, pp. 161-202.

(০৪) В. П. Якимов, *Ближайшие предшественники человека,* В сб.: «У истоков человечества», отв. ред. В. П. Якимов, М., изд. МГУ, 1964, стр. 52-82.
V. P. Yakimov, *The Nearest Ancestors of Man,* In the Book: «Near the Source of Mankind», edited by V. P. Yakimov, M., MSU, 1964, pp. 52-82.
— М. Ф. Нестурх, *Проблемы первоначальной прародины человечества,* В сб.: «У истоков человечества», М., изд. МГУ, 1964, стр. 7-32.
M. F. Nesturkh, *Problems Concerning the First Nativeland of Mankind,* In the Book: «Near the Source of Mankind», M., 1964, pp. 7-32.
— S. D. Kaushic, *Indo-Tibetan Cradle Land of Humanity,* Proc. Nat. acad. Sci. India, sector B., Vol. XXIV, pt. II, 1964, pp. 49-61.

(০৫) М. Ф. Нестурх, *Ископаемые гигантские антропоиды Азии и ортогенетическая гипотеза антропогенеза Вейденрейха,* «Ученые записки МГУ», вып. 166, 1954, стр. 29-46.
M. F. Nesturkh, *The Giant Fossil Anthropoids of Asia and Weidenreich's Orthogenetic Hypothesis of Anthropogenesis,* Uchonyii zapiski Moskovskovo Universiteta, No. 166, 1954, pp. 29-46.
— В. П. Якимов, *Рецензия на работу Кенигсвальда о гигантопитеке.* «Советская этнография», № 1, 1955, стр. 153-155.
V. P. Yakimov, *Review on the Work of Königswald on Gigantopithecus,* Sovetskaya Etnografia, No. 1; 1955, pp. 153-155.

(০৬) М. А. Гремяцкий, *К вопросу о филогенетических связях древнейших гоминид,* «Краткие сообщения института этнографии АН СССР», т. XV, 1952, стр. 62-71.
M. A. Gremyatsky, *The Philogenetic Links of Ancient Hominids.* A Short Review of Etnographical Institute Acad. Sc. USSR, Vol. XV, 1952, pp. 62-71.
— *Ископаемые гоминиды и происхождение человека.* Сб. статей под ред. В. В. Бунака, М., изд. «Наука», 1966.
Fossil Hominids and Origin of Man, Collected Articles, edited by V. V. Bunak, M., Nauka, 1966.

(০৭) М. Ф. Нестурх, *Звенья родословной человека,* «Природа» № 1, 1957, стр. 32-41.

M. F. Nesturkh, *Links of Man's Genealogical Chain,* Priroda, No. 1, 1957, pp. 32-41.

(৩৮) Н. О. Бурчак-Абрамович, Е. Г. Габашвили, *Высшая человекообразная обезьяна из верхнетретичных отложений восточной Грузии (Кахетии),* «Вестник Государственного Музея Грузии», т. XIII-A, 1946, стр. 253-273.
N. O. Burchak-Abramovich, Y. G. Gabashvilli, *A Higher Anthropoid Ape from the Upper Tretiary Deposits of East Georgia (Kakhetia),* Vestnik Gos. Muzea Gruzii, Vol. XIII-A, 1946, pp. 253-273.

(৩৯) В. П. Якимов, *Открытие костных остатков нового представителя австралопитековых в Восточной Африке,* «Вопросы антропологии», № 4, 1960, стр. 151-154.
V. P. Yakimov, *Discovery of Bone Remains of New Representative of Australopithecus in East Africa,* Voprosi Antropologii, No. 4, 1960, pp. 151-154.

(৪০) М. Ф. Нестурх, *Против идеализма на фронте антропогенеза,* «Фронт науки и техники», № 5, 1937, стр. 50-80.
M. F. Nesturkh, *Against Idealism on the Anthropological Front,* Front Nauki i Tekhniki, No. 5, 1937, pp. 50-80.

— М. Ф. Нестурх, *Проблема первоначальной прародины человечества,* В сб. «У истоков человечества (основные проблемы антропогенеза)», М., изд. МГУ, 1964, стр. 7-32.
M. F. Nesturkh, *Problems Concerning the First Nativeland of Mankind.* In the book: 'Near the Source of Mankind (Main Problems of Anthropogenesis)', M., 1964 pp. 7-32.

— В. П. Алексеев, *От животных — к человеку,* М., изд. «Советская Россия», 1969.
V. P. Alekseev, *From Animals — to Man.,* M., Sovietskaya Rossia, 1969.

— Я. Я. Рогинский, *Проблемы антропогенеза,* М., изд. «Высшая школа», 1969.
Y. Y. Roginsky, *Problems of Anthropogenesis,* M., Vischaya Shkola, 1969.

— М. И. Урысон, *Некоторые проблемы антропогенеза в свете новых палеоантропологических открытий.* В книге «Антропология 1969». «Итоги Науки», Серия «Биология», М., 1970, стр. 65-91.
M. I. Urison, *A Few Problems of Anthropogenesis in the Light of New Palâeoanthropological Discoveries.* In the Book: 'Anthropology 1969'. Itogi Nauki, seria 'Biologia', M., 1970, pp. 65-91.

— M. F. Nesturkh, *The Origin of Man.* Foreign Language Publishing House, Moscow 1959, 2nd (revised) edition, Progress Publishers, Moscow, 1967.
— M. F. Nesturkh, *The Races of Mankind,* Foreign Language Publishing House, Moscow, 1963, 2nd (revised) eition, Progress publishers, 1966.

(৪১) Макс Вебер, *Приматы. Анатомия,систематика и палеонтология лемуров, долгопятов и обезьян,* пер., ред. и допол. М. Ф. Нестурх, М., Биомедгиз, 1936.
Maks Veber, *Primates, Anatomy, Taxonomy and Palâeontology of Lemures and Other* Apes, translated, edited and revised by M. F. Nesturkh, M., Biomedgiz. 1936.
— В. Н. Жеденов, *Сравнительная анатомия приматов,* под ред. М. Ф. Нестурха, изд. «Высшая школа», 1961.
V. N. Zhedenov, *Comparative Anatomy of Primates,* edited by M. F. Nesturkh, Vischaya Shkola, 1961.

(৪২) Ю. Г. Шевченко, *Эволюция коры мозга приматов и человека* М., изд. МГУ, 1971.
Y. G. Shevchenko, *Evolution of the Cerebral Cortex of Primates and Man,* M., 1971.
— Ю. Г. Шевченко, *Онтогенез коры мозга человека в аспекте антофилогенетических соотношений,* Л., изд. «Медицина», 1971.
Y. G. Shevchenko, *Onthogenesis of Cerebral Cortex of Man in the Aspect of Anthophyllogenetical Relationships,* L., Meditsina, 1971.

(৪৩) С. М. Блинков, *Особенности строения головного мозга человека (Височная доля человека и обезьяны),* М., Медгиз, 1955, стр. 95-98.
S. M. Blinkov, *Features of the Structure of Man's Brain. The Temporal Lobe in Man and the Apes,* Medgiz, 1955. pp. 95-98.

(৪৪) Ю. Г. Шевченко, *Индивидуальные и групповые вариации строения коры большого мозга (нижнетеменной области) современных людей,* «Вестник Академии Медицинских Наук», № 5, 1956, стр. 35-45.
Y. G. Shevchenko, *Individual and Group Variations in the Cerebral Cortex (Lower Parietal Area) of Modern Man,* Vestnik Akademii Meditsinskikh Nauk, No. 5, 1956. pp. 35-45.

(৪৫) Л. А. Кукуев, В. А. Бец (1834-1894), М., Медгиз 1950.
L. A. Kukuev, V. A. Bets (1834-1894), M., Medgiz, 1950.

(৪৬) К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч. изд. 2,* т. 20, стр. 490.

K. Marx and F. Engels, *Collected Works., 2nd ed., Vol. 20, p. 490.*

(৪৭) В. И. Кочеткова, *Палеоневрология, её современное состояние.* В книге: «Антропология 1969», «Итоги Науки», Серия «Биология», М., 1970, стр. 92-120.
V. I. Kochetkova, *Paláeontology and Its Present State.* In the Book: 'Anthropology 1969', Itogi Nauki, Seria Biologia, M., 1970, pp. 92-120.

(৪৮) К. Э. Фабри, *Хватательная функция руки приматов и факторы её эволюционного развития,* VII международный конгресс антропологических и этнографических наук, Москва (3—10 августа 1964 г). т. III, М., Наука, 1968, стр. 496-502.
K. E. Fabri, *Gripping Function of the Hands of Primates and the Factors of Its Evolutionary Development,* VII International Congress of Anthropological and Etnographical Scienses, Moscow (3-10 August, 1964), Vol. III, M., Nauka, 1968, pp. 496-502.

(৪৯) Л. П. Астанин, *Органы тела и их работа,* М., изд. «Советская Наука», 1958 (см. главу *Свободная верхняя конечность* стр. 52-66).
L. P. Astanin, *Organs of Body and Its Function,* M., Sovietskaya Nauka, 1958 (see chapt. *Free Upper Extremities,* pp. 52-66).
— Л. П. Астанин, *Влияние физических упражнений на пропорции руки человека,* «Природа», № 6, 1952, стр. 42-53.
L. P. Astanin, *The Influence of Physical Exercises on the Proportions of Man's Hand,* Priroda, No. 6., 1952, pp. 42-53.
— Е. И. Данилова, *Эволюция руки в связи с вопросами антропогенеза,* Киев, изд. «Науково думка», 1965.
E. I. Danilova, *Evolution of Hand in Connection with the Anthropogenetical Problems,* Kiev, Naukovo Dumka, 1965.

(৫০) Н. Н. Миклухо-Маклай, *Путешествия,* т. 1, М, изд. АН СССР, 1940, стр. 216.
N. N. Miklukho-Maklai, *Travels,* Vol. 1, M., 1940, p. 216.
— Я. Я. Рогинский, Н. Н. Миклухо-Маклай, «Советская этнография», № 2, 1946. стр. 5-16.
Y. Y. Roginsky, N. N. Miklukho-Maklai, Sovietskaya Etnografia, No. 2, 1946, pp. 5-16.

(৫১) А. А. Зубов, *Человек заселяет свою планету,* М., Географгиз, 1963.
A. A. Zubov, *Man is Populating His Planet,* M., 1963.

(৫২) Я. Я. Рогинский, *Величина изменчивости измерительных признаков черепа и некоторые закономерности их корреляции у человека.* «Ученые записки МГУ», вып. 166 (Труды Научно-исследовательского института антропологии), 1954, стр. 57-92.
Y. Y. Roginsky, *The Extent of Mutation in Skull Measurements and Some Laws for their Correlation in Man,* 'Uchonii Zapiski Moskovkovo Universiteta'. No. 166, 1954, pp. 57-92.
— И. И. Шмальгаузен, *Кибернетические вопросы биологии,* под общей ред. Р. Л. Берг и А. А. Ляпунова, Новосибирск, изд. «Наука», 1968.
I. I. Shmalgausen, *Cybernatical Questions in Biology,* edited by R. L. Berg and A. A. Lyapunova, Novosibirsk, Nauka, 1968.

(৫৩) Я. Я. Рогинский, М. Г. Левин, *Антропология,* изд. 2ое, испр, и дополн., М. изд. «Высшая школа», 1963, стр. 448-451.
Y. Y. Roginsky, M. G. Levin, *Anthropology,* 2nd ed, revised and added, M., Vischaya Shkola, 1963, pp. 448-451.
— М. Ф. Нестурх, *Первоначальная прародина человечества.* В сб.: «У истоков человечества» (основные проблемы антропогенеза) отв. ред. В. П. Якимова, М., изд. МГУ, 1964, стр 7-32.
M. F. Nesturkh, *The First Nativeland of Mankind.* In the Book: 'Near the Source of Mankind' (Main Problems of Anthropogenesis) edited by V. P. Yakimova, M., 1964, pp. 7-32.

(৫৪) В. П. Алексеев, *О первичной дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования,* «Советская этнография», № 1, 1969, стр. 12-24.
V. P. Alekseev, *The Primary Differentiation of Mankind in Races. The Primary Centre of Race Formation,* Sovietskaya Etnografia, No. 1, 1969, pp. 12-24.

(৫৫) М. Г. Левин, *Новая теория антропогенеза Ф. Вейденрейха,* «Советская этнография», № 1, 1974, стр. 213-218.
M. G. Levin, *F. Weidenreich's New Theory of Anthropogenesis,* Sovietskaya Etnografia, No. 1, 1947, pp. 213-218.

(৫৬) Я. Я. Рогинский, *Теория моноцентризма и полицентризма в проблеме происхождения современного человека и его рас,* М., изд. МГУ, 1949.
Y. Y. Roginsky, *The Monocentrist and Polycentrist Theories in the Problem of the Origin of Modern Man and His Races,* M., 1949.

(৫৭) Я. Я. Рогинский, *Основные антропологические вопросы в проблеме происхождения современного человека.* В сб.: «Происхождение человека и древнее расселение человечества». «Труды Института этнографии АН СССР имени Миклухо-Маклая», Новая Серия, т. XVI, М., изд. АН СССР, 1951, стр. 153-204.
Y. Y. Roginsky, *Fundamental Anthropological Questions in the Problem of Origin of Modern Man.* In the Book 'Origin of Man and Ancient Migration of Mankind'. Works of Etnographical Institute, Novaya Seria, Vol. XVI, M., 1951, pp. 153-204.
— Я. Я. Рогинский, *Аргументы в пользу моноцентризма,* «Природа» №. 10, 1970, стр. 34-37.
Y. Y. Roginsky, *Arguments in Favour of Monocentrism,* Priroda, No. 10, 1970, pp. 34-37.

(৫৮) Сб. «Народы Африки», М., изд. АН СССР, 1955.
'Peoples of Africa', M. 1955.

(৫৯) В. Р. Кабо, *К вопросу о происхождении австралийцев и древности населения Австралии,* «Вопросы антропологии», № 7, 1961, стр. 77-94.
V. R. Kabo, *The Question of the Origin of the Australian Aborigines and the Antiquity of the Population of Australia,* Voprosi Antropologii, No. 7, 1961, pp. 77-94.
— В. Р. Кабо, *Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии,* М., изд. «Наука», 1968.
V. R. Kabo, *Origin and the Earliest History of the Aborigines of Australia,* M., Nauka, 1968.

(৬০) В. П. Алексеев, *О первичной дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования.* «Советская этнография», № 1, 1969, стр. 12-24.
V. P. Alekseev, *The Primary Differentiation of Mankind in Races, The Primary Centre of Race Formation,* Sovietskaya Etnografia, No. 1, 1969, pp. 12-24.

(৬১) С. А. Семенов, *О сложении защитного аппарата глаз монгольского расового типа,* «Советская этнография», № 4, 1951, стр. 156-179.
S. A. Semyonov, *The Formation of the Protective Apparatus of the Eye in the Mongolian Racial Type,* Sovietskaya Etnografia, No. 4, 1951, pp. 156-179.

(৬২) *Наука о расах и расизм,* «Труды Научно-исследовательского Института антропологии МГУ», вып. IV, М.-Л., изд. АН СССР, 1938.

Science of Races and Racism, Works of the Anthropological Research Institute of MSU, No. 4, M.-L, 1938.

(৬৩) *Документы международного совещания коммунистических и рабочих партий*, М., Политиздат, 1969, стр. 39.
Documents of the International Communist and Worker Parties' Conference, M., Politizdat, 1969, p. 39.

(৬৪) Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебаксарова, *Народы, расы, культура*, М., изд. «Наука», 1971.
N. N. Cheboksarov, I. A. Cheboksarova, *Peoples, Races, Cultures*, M., Nauka, 1971.

(৬৫) Т. Д. Гладкова, *Человеческие расы*, М., изд. «Знание», 1962.
T. D. Gladkova, *The Races of Man*, M., Znanie, 1962.

(৬৬) Ч. Дарвин, *Происхождение человека и половой отбор. Выражение эмоций у человека и животных*, Соч. Т. 5, М., 1953, стр. 186.
C. Darwin, *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*, London, 1901, pp. 98-99.

(৬৭) Ч. Дарвин, *Происхождение человека и половой отбор. Выражение эмоции у человека и животных*, Соч. Т. 5, М., 1953. стр. 254.
C. Darwin, *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*, London, 1901, p. 221.

(৬৮) Эмиль Виллигер, *Головной и спинной мозг*, пер. с нем. М., Гос. изд-во, 1930.
Emile Williger, *Cerebrum and Spinal Brain*, M., 1930.

(৬৯) М. Г. Левин, *Международный конгресс по антропологии и этнографии*. Сб.: «Советская этнография», вып. VI-VII, 1947, стр. 335-347.
M. G. Levin, *International Congress on Anthropology and Ethnography*. Sovietskaya Etnografia, VI-VII, 1947, pp. 335-347.

(৭০) *Расовая проблема и общество*. Сборник переводов с французского. Общая редакция и вступительная статья М. С. Плисецкого, М., изд. «Иностранная литература» 1957.
Race Problem and Society. Collected translations from French. M., Inostrannaya Literatura, 1957.

(৭১) Н. Н. Миклухо-Маклай, собр. соч., т.т. I—V, М., изд. АН СССР, 1950-1954.
N. N. Miklukho-Maklai, *Collected Works*, Vols, I-V, M., 1950-1954.

— Я. Я. Рогинский, *Н. Н. Миклухо-Маклай,* М., изд. «Правда», 1948.
Y. Y. Roginsky, *N. N. Miklukho-Maklai,* M., Pravda, 1948.

(৭২) Н. Г. Чернышевский, *О расах.* Избранные философские сочинения. т. III, М., Госполитиздат, 1951, стр. 557-579.
N. G. Chernishevsky, *On Races.* Selected Philosophical Essays, Vol. III, M., Gospolitizdat, 1951, pp. 557-579.
— М. Г. Левин, *Н. Г. Чернышевский о расах и расовой проблеме* (к шестидесятилетию со дня смерти). «Советская этнография», № 4, 1949, стр. 147-155.
M. G. Levin, *N. G. Chernyshevsky on Races and Race Problem* (On the Sixtieth Anniversary of His Death). Sovietskaya Etnografia, No. 4, 1949, pp. 147-155.

(৭৩) И. М. Сеченов, *Избранные философские и психологические произведения,* М., Госполитиздат, 1947, стр. 223.
I. M. Sechenov, *Selected Philosophical and Psychological Works,* **F. L. P. H., Moscow, 1962.**

(৭৪) *Народы Африки* под ред. А. А. Ольдерогге, И. И. Потехина, М., изд. АН СССР, 1955.
***Peoples of Africa,* edited by A. A. Olderogge, I. I. Potekhin, M., 1955.**

(৭৫) В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 228.
V. I. Lenin. *Collected Works,* Vol. 35, p. 288.

(৭৬) П. Н. Федосеев, *О социальных и идейных основах сближения нации и народностей.* В кн: «Наука Союза ССР», М., «Наука», 1972, стр. 46-79.
P. N. Fedoseev, *On the Social and Ideological Bases Nearing the Nations and Peoples.* In the Book: 'Science in USSR', M., **Nauka, 1972, pp. 46-79.**

(৭৭) «Правда», 22 декабря, 1972.
Pravda, 22nd December, 1972.

(৭৮) Х. Виейра, *Торжество Ленинского учения по национальному вопросу.* В журнале «Коммунист», М., № 17, 1972, стр. 49-51.
K. Vyeira, *Victory of Lenin's Teachings on National Questions,* Kommunist, M., No. 17, 1972, pp. 49-51.

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union